ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অনুসন্ধানী পাঠ

ষষ্ঠ শ্রেণি

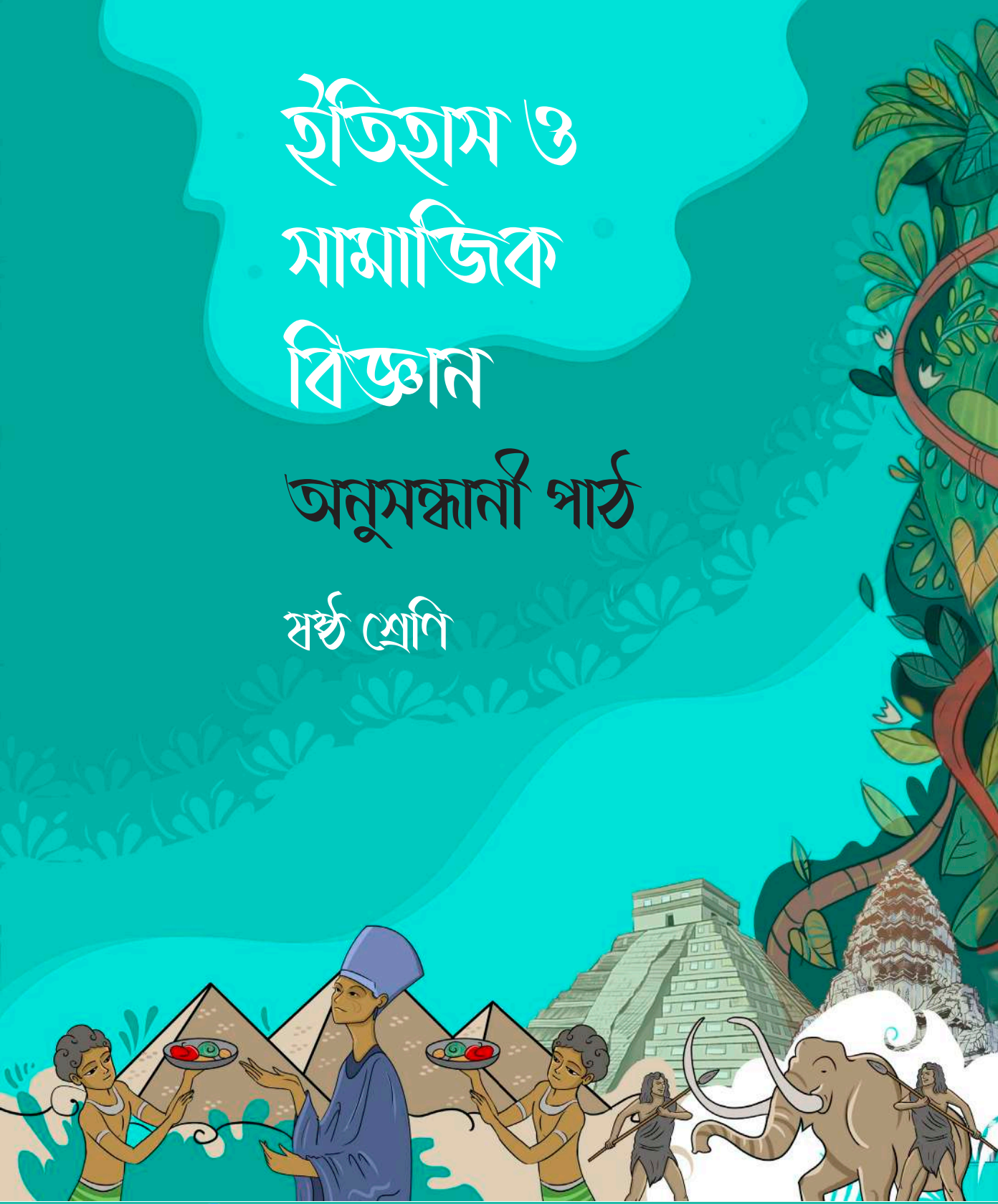

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জেনারেল স্যাম মানেকশ
ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান

এডওয়ার্ড কেনেডি
আমেরিকান সিনেটর

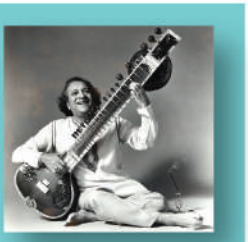

পন্ডিত রবিশঙ্কর
ভারতীয় সেতারবাদক ও সঙ্গীতশিল্পী

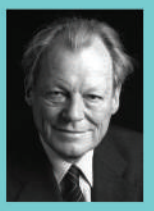

উইলি ব্রান্ট
চ্যান্সেলর
জার্মানি ফেডারেল রিপাবলিক

আলেক্স কোসিজিন
রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

মার্শাল টিটো
যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট

আঁদ্রে মালরো
ফরাসি লেখক ও রাজনীতিবিদ

জে.এফ.আর. জ্যাকব
ভারতীয় সেনাবাহিনীর
লেফটেন্যান্ট জেনারেল

সিডনি শনবার্গ
আমেরিকান সাংবাদিক

এলেন গিন্সবার্গ
আমেরিকান কবি

সায়মন ড্রিং
ব্রিটিশ সাংবাদিক

উইলিয়াম এ এস অর্ডারল্যান্ড
অস্ট্রেলিয়ান, বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী কয়েকজন বিদেশি বন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

আবুল মোমেন

অধ্যাপক এম. শহীদুল ইসলাম

অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি

অধ্যাপক স্বাধীন সেন

ড. আকসাদুল আলম

ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু

অধ্যাপক ড. পারভীন জলী

ড. সুমেরা আহসান

মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান

রায়হান আরা জামান

সিদ্দিক বেলাল

উমা ভট্টাচার্য্য

সানজিদা আরা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ
প্রমথেশ দাস পুলক
তামান্না তাসনিম সুপ্তি

প্রচ্ছদ
ইউসুফ আলী নোটন

গ্রাফিক্স
মো: রুহুল আমিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নতুন বছরে নতুন শ্রেণিতে তোমাদের অভিনন্দন, স্বাগতম।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া মানে শিক্ষায় প্রাথমিক পর্ব শেষ করে মাধ্যমিকে প্রবেশ। তোমাদের জন্য পড়ালেখার নতুন এক পদ্ধতি নিয়ে আমরা অপেক্ষায় আছি। এ পদ্ধতিতে তোমাদের আর পরীক্ষা এবং ভালো নম্বরের পিছনে ছুটতে হবে না। কেবল পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্ন জানা আর সেসবের উত্তরের খোঁজে থাকতে হবে না। এখন থেকে উত্তর মুখস্থ করাও তোমাদের মূল কাজ নয়। বাবা-মায়েরও ভালো টিউটর, কোচিং সেন্টার, গাইড বই আর তোমাদের পরীক্ষা ও প্রশ্ন নিয়ে উদ্বেগে কাটাতে হবে না। অযথা অনেক টাকাও খরচ করতে হবে না।

আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকের রয়েছে এক একটা সতেজ মন আর একটা করে খুবই সক্রিয় মস্তিষ্ক। তোমাদের কল্পনা শক্তি যেমন আছে, তেমনি আছে বুদ্ধি, তা খাটিয়ে পেয়ে যাও ভাবনার নানা পথ। মন আর মস্তিষ্কের মতো আরও কয়েকটা যোগ্যতা নিয়েই জন্মেছ সবাই। এগুলোর কথা বিশেষভাবে বলতে চাই। বলছি মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তির কথা। তোমরা আগেই জেনেছ আমাদের সবার আছে পাঁচটি করে বিশেষ প্রত্যঙ্গ- চোখ, কান, নাক, জিহ্বা আর ত্বক। এগুলো ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, এ হলো দৃষ্টিশক্তি, আর এটিকে বলি দর্শনেন্দ্রীয়। তেমনি কানে শুনি, এটি শ্রবণেন্দ্রিয়, নাক দিয়ে শুঁকি বা ঘ্রাণ নেই, এটি ঘ্রাণেন্দ্রিয়। জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি, এটি স্বাদেন্দ্রিয়; আর ত্বক দিয়ে স্পর্শ করি, এটি স্পর্শেন্দ্রিয়। কিছু চিনতে, বুঝতে, জানতে এগুলো আমাদের সহায়তা করে। তাই ইন্দ্রিয়গুলো এত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ।

এতসব সম্পদ মিলিয়ে তোমাদের প্রত্যেকের আছে-

অফুরন্ত প্রাণশক্তি
সীমাহীন কৌতূহল
আনন্দ পাওয়ার অসীম ক্ষমতা এবং
বিস্মিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা।

আধুনিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পরীক্ষা আর উত্তর মুখস্থ করার যে চাপ, তাতে তোমাদের এসব স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষায় বরং শিক্ষার্থীদের এই ক্ষমতাগুলোকেই কাজে লাগানো দরকার, তাতেই ভালো ফল মিলবে।

এ থেকে তোমাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা নিশ্চয় পেয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ এই ব্যবস্থায় তোমরা বেশ স্বাধীনতা পাচ্ছ। তবে ভুলো না, স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে দায়িত্বও নিতে হয়। আচ্ছা, পড়ালেখাটা তো তোমার নিজেরই কাজ, নিজের জন্যই। তো নিজের কাজ নিজে করবে, এত খুব ভালো কথা।

তবে আসল কথা হলো, কোনো কাজে যখন নিজেই সফল হবে, তাতে আনন্দ যে কত বেশি তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারো। তাই নতুন পথে শিক্ষা হবে আনন্দময় যাত্রা, পথচলা। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে- যাত্রাপথের আনন্দগান। শিক্ষা হলো আনন্দগান সেই অভিযাত্রা- যেন গান করতে করতে পথ চলেছ।

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে মাত্রই উঠেছ। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ। নতুন শ্রেণির পাঠের অনেক কিছুই হবে নতুন, অনেকটা অজানা। তবে অজানা আর নতুন বলেই তো এ পথচলাটা হবে অভিযানের মতো। পথে যে চ্যালেঞ্জ থাকবে সেগুলো পেরোনোর অভিজ্ঞতা থেকে যেমন অনেক কিছু জানবে, শিখবে, করবে, তেমনি পাবে অফুরন্ত আনন্দ।

অথচ এর জন্য বাড়তি কোনো খরচ লাগবে না। কারণ, চ্যালেঞ্জ মোকবিলার জন্য তোমাদের ভাঁড়ারে আছে নিজস্ব শক্তিশালী হাতিয়ার- কৌতূহল, বিস্ময়বোধ, প্রাণশক্তি এবং আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়গুলো এতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। আর মজা হলো এগুলো টাকাপয়সার মতো নয়, ব্যবহারে খরচ না হয়ে বরং বাড়ে। কারণ, এসবই তোমার মনের সম্পদ, তুমি যত চর্চা করবে, ততই এগুলো ঝকঝকে থাকবে, কাজে হবে দক্ষ। বরং এগুলোর প্রেরণায় তোমাদের নতুন নতুন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। প্রথম ডাক পড়বে বুদ্ধির। নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে হবে, ভাবতে হবে, আবার ভাবতে গেলে যুক্তির প্রয়োজন। এ হলো চর্চার বিষয়-বুদ্ধি খাটালে তা আরও বাড়বে, দেখবে কোনো কোনো গাছের ডাল-পাতা ছেঁটে দিলে গাছটি বাড়ে ভালো, ফলও দেয় বেশি। তোমাদের চাই বুদ্ধিকে খাটানো, যুক্তিতে শান দেওয়া। আর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখতে হবে, তাতে এগুলোয় দক্ষতাও বাড়তে পারবে।

এভাবে অজানাকে জয় করবে, অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে চলতে চলতে বিস্ময়ে-আনন্দে মজে কখন যে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তবে শুরু হোক এই জয়যাত্রা!

সূচিপত্র

ইতিহাস জানা যায় কীভাবে?	১-২০
মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে?	২১-৪৫
সভ্যতার বিকাশ: এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে নগরায়ণ ও রাষ্ট্র	৪৬-১২২
বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়ের ইতিহাস: রূপান্তর, বৈচিত্র্য ও সম্মিলন	১২৩-১২৮

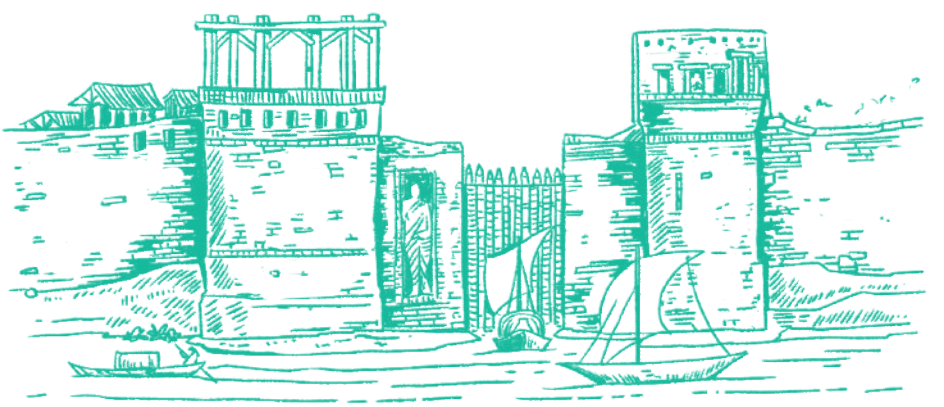

ইতিহাস জানা যায় কীভাবে?

তোমাদের একটা ছোট গল্প বলি। শোনো। সজীব, রত্না, সালমা, শাকিল, মাইকেল ও মনীষা একসঙ্গে একদিন বল খেলছিল মাঠে। মাঠের পাশেই জঙ্গল। বল ওই জঙ্গলে হারিয়ে গেল। ওরা সবাই মিলে জঙ্গলে বল খুঁজছে তো খুঁজছেই। বলটা তো আর পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে বিকাল হয়ে গেছে। আলোও কম। হঠাৎ সালমা ও মনীষা জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা দালান দেখতে পেল। ওরা বন্ধুদের বলল, 'ওখানে গিয়ে বলটা খুঁজি। তখন শাকিল ও সজীব বলল, 'ওখানে কে না কে থাকে জানি না। যদি আমাদের মারে। আটকে রেখে দেয়। যদি ভূত থাকে!' সালমা ও মনীষার সাহস বেশি। ওরা সবাইকে জোর করে ওই ভাঙা দালানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাঙা দালানের একটা রুমে ওরা খুঁজে পেল কয়েকটা ভাঙা চেয়ার, একটা খাট, একটা ভাঙা টেবিল। ঘরের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো পুরোনো খবরের কাগজ। একটা পানি ভরা মাটির কলসি।

পাশের রুমে ঢুকে তারা অবাক। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরা। একটা টেবিলের ওপরে রাখা কয়েকটা খাতা ও ডায়েরি। কতকগুলো তালপাতা। উপরে লেখা। ওরা লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল। দেখতে অনেকটাই বাংলা অক্ষরের মতন। কিন্তু কোথায় যেন অমিল আছে। বেশ প্যাচানো, লাল কালিতে সুন্দর করে লেখা। পাশেই রাখা কয়েকটি সাদা-কালো ফটো। তাতে কয়েকজন মানুষ একটা ভাঙাচোরা বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওই বিল্ডিংয়েরও কয়েকটা ছবি। দেয়ালে আঁকা ছবি। খোদাই করা কারুকাজ। ওরা আরও দুটো রুমে ঢুকল। সেগুলোতে ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে মেঝেতে। ওখানে কেউ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক খুঁজেও ওরা বলটা পেল না, ওই ভাঙগা দালানে। কিন্তু ওরা জঙ্গলের মধ্যের ভাঙা দালান, দালানের মধ্যের জিনিসপত্র, খবরের কাগজ, ডায়েরি, ফটো, অচেনা হাতে লেখা তালপাতা, ভাঙা মাটির পাত্র নিয়ে ভাবতে থাকল। নিজেরা নিজেরা বাড়ি থেকে বের হয়ে জঙ্গলের পথে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। 'কে থাকে ওই ভাঙা, জঙ্গলের মধ্যে দালানে?' 'কেন ওখানে তিনি একা একা থাকেন?' পুরোনো খবরের কাগজ, অচেনা হাতে লেখা ডায়েরি ও তালপাতায় কী লেখা আছে?' 'মাটির পাত্রের টুকরাগুলো তিনি কেন জমা করেছেন?' 'ফটোর লোকগুলো কারা?' 'ফটোর ওই দালানটি কোথায়?' 'ওই পুরানো লেখা, ফটো, মাটির পাত্রর টুকরা কত পুরানো?' 'কারা তালপাতায় লিখত?' 'তখন কি কাগজ ছিল না?' 'বাংলা অক্ষরের মতন?'

লেখা ভাষা পড়া যাবে কী করে?' 'ওই পুরোনো দালানে টেবিল, চেয়ার ও খাট কোথা থেকে এলো?' 'এই দালানটি যখন একদম নতুন ছিল, তখন কেমন ছিল?' 'কারা সেখানে থাকতেন?' 'তারা কোথায় গেলেন?' 'কেন চলে গেলেন?' 'তখনও কি এই জঙ্গল ছিল'– এমন হাজারটা প্রশ্ন ওদের সবার মাথায় কিলবিল করতে থাকল। পরে ওরা ঠিক করল স্কুলের এনায়েত স্যার আর অনিতা ম্যাডামকে সবকিছু খুলে বলবে। তারা অনেক কিছু জানেন। নিশ্চয়ই এই ভাঙা দালান আর দালানের জিনিসপত্র সম্পর্কে তারা অনেক কিছু বলতে পারবেন। পরের দিন স্কুলে যাওয়ার পরে অফ পিরিয়ডে ওরা সবাই স্যার আর ম্যাডামের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলল। স্যার ও ম্যাডাম তো ওদের সাহস ও বুদ্ধি দেখে খুব অবাক। তারা ওদের সবাইকে বললেন, 'তোমরা তো বিরাট আবিষ্কার করেছ। আমরাও তো জানি না যে জঙ্গলের মধ্যে কোনো ইতিহাস লুকিয়ে আছে। ওই দালানে যিনি থাকেন তিনি নিশ্চয়ই হয় পুরোনো ইতিহাস নিয়ে বা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি বাংলা ছাড়াও আরও ভাষা পড়তে পারেন। পুরোনো এই তাল পাতার লেখা, মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরা, পুরোনো দালানের ফটো থেকে তিনি পুরোনো সময়ের বিভিন্ন ঘটনা জানার চেষ্টা করেন। একদিন তোমাদের সঙ্গে আমরাও যাবো ওই ভাঙা দালানে।

ইতিহাসের উৎস, উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

তোমরা মনে করতে পারো, ইতিহাস একটি কঠিন বিষয়। ইতিহাস জানার জন্য অনেক কিছু জানা লাগে। উপরের গল্পটি পড়ে কী শিখলে? আসলে কিন্ত ইতিহাস জানা ততটা কঠিন ও জটিল না। আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে অনেক উপাদান, মানুষ বা বস্তু। এগুলোই যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলেই আমরা এগুলোর অতীত নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারব। পুরোনো জিনিসপত্র, পুরোনো দলিলপত্র, খবরের কাগজ, চিঠিপত্র, ম্যাগাজিন, বইপত্র, দোকানের হিসাবের খাতা, তোমার বাসার দলিল, মা-বাবার ডায়েরি, নানার চশমা বা ঘড়ি বা হাঁটার লাঠি। চারদিকে, ঘরের মধ্যে ও বাইরে। ছড়িয়ে আছে নানান কিছু। অতীতে কী ঘটেছিল, কখন ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল ও কীভাবে ঘটেছিল তা জানতে, বুঝতে আর ব্যাখ্যা করতে এসব জিনিসপত্র কাজে লাগতে পারে। তোমার মা-বাবার সঙ্গে তাদের ছোটবেলার কথা, পড়াশুনার কথা, আশপাশের লোকজনের কথা জিজ্ঞেস করো। তাদের গল্প শুনতে চাও। সেই গল্পও হতে পারে ইতিহাস। তোমার আশপাশের কোনো মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথা বলো। তিনি তোমাদের বলবেন মুক্তিযুদ্ধের গল্প। পাশের খালাম্মা বা দাদিজানের কাছে জানতে চাও মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কথা। তারাও তোমাকে যে গল্প বা কাহিনি বলবেন, তা-ও একধরনের ইতিহাস।

ইতিহাসে তিনটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলো সময়। আরেকটা হলো স্থান। তৃতীয়টি হলো যাদের ইতিহাস জানতে চাচ্ছ তারা। তারা মানুষ হতে পারে। নদী হতে পারে। মাটি হতে পারে। পরিবেশ হতে পারে। যেকোনো প্রাণী বা গাছপালাও হতে পারে। তোমার পাশে যে বড় গাছটি আছে, সেই গাছটি ছোট থেকে বড় হয়েছে। সেই গাছটি তার চারপাশে নানা ঘটনা ঘটতে দেখেছে। সমস্যা হলো, গাছটি আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না। তোমার পাশের পুকুর বা বিলটি। তোমার পাশের নদীটি। সেগুলোও কতকাল আগে থেকে কতকিছু দেখেছে। নিজেরা বদলে গেছে। কখনো পানি থাকে। কখনো পানি থাকে না। কত প্রাণী, উদ্ভিদ, মাছ, পোকামাকড়, সাপ এখানে একসময় ছিল। সেগুলো হয়তো মরে গেছে। নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। মুশকিল হলো, এসব প্রাণীর কোনোটি আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না। তাই যারা আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না তাদের ভাষা আমরা শিখতে পারি। তাদের জানার উপায় আমরা খুঁজতে পারি। তাদের অতীত কেমন ছিল তা-ও জানার চেষ্টা করতে পারি। সেই অতীত কাহিনিগুলোই হবে ইতিহাস।

ইতিহাস হতে পারে কোনো একটি জেলার ইতিহাস, একটি বিভাগের ইতিহাস, একটি দেশের ইতিহাস, একটি অঞ্চলের ইতিহাস, কোনো ভূপ্রাকৃতিক ভাবে ভিন্ন স্থানের ইতিহাস। বিভিন্ন স্থানের আজকে (বর্তমানে) যে নাম ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, অতীতে সেই নাম ও বৈশিষ্ট্য না-ও থাকতে পারে। আজ যেসব মানুষ একটা জায়গায় বসবাস করে অতীতে তারা সেখানে থাকতে পারে। হয়তো তাদের বাবা, মা, দাদু বা নানা সেখানে বসবাস করতেন। হয়তো ৫০ বা ১০০ বছর আগে তাদের বাবা, মা, নানা ও দাদা সেখানে বসবাস করতেন।

তাহলে ইতিহাস প্রধানত অতীত কালের বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা, মানুষজন, পরিবেশ, গাছপালা নিয়ে আলাপ করে। কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গার অতীতের ঘটনা নিয়ে, অতীতের ঘটনা ঘটার কারণ নিয়ে বর্ণনা জানতে ও লিখতে পারে। সেই লেখা হবে ইতিহাস। তবে সেই অতীত কালের ঘটনাগুলো, সেগুলোর বর্ণনা, সেগুলো ঘটার কারণ খোঁজার কাজটা কিন্তু ধাপে ধাপে করতে হয়। কোনো বিষয়ের ইতিহাস বা কার ইতিহাস আমরা জানার ও লেখার জন্য বেঁছে নিয়েছি তা-ও জানার পদ্ধতি ঠিক করে দেয়। আবার ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আলোচনা ও লেখার ক্ষেত্রে একটা শুরু ও শেষ থাকতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বা হঠাৎ করেই কোনো কারণে

কীভাবে সেই ঘটনাগুলো ঘটল বা ঘটা বন্ধ হলো। কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল তা জানতে, বুঝতে ও লিখতে হয়। এভাবে অতীতের নানা সময়ের ইতিহাস জানার জন্য সময়ের একটা ধারাবাহিক রূপরেখা ব্যবহার করা হয়। এই রূপরেখাকে বলে কালানুক্রম বা সময়ের অনুক্রম। ১০০ বছর আগে, ২০০ বছর আগে, ৫০০ বছর আগে,

এক হাজার বছর আগে, দশ হাজার বছর আগে, এক লক্ষ বছর আগে– বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস জানাই সময়ের অনুক্রমের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস জানা। ইতিহাসে এই কালানুক্রম বোঝার জন্য অতীতের বিভিন্ন সালকে আমাদের পরিচিত ক্যালেন্ডারের সাল ও তারিখ অনুসারে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হয়। সেই ক্যালেন্ডার হতে পারে গ্রেগরিয়ান বা খ্রিষ্টীয় অথবা বাংলা সাল বা হিজরি সাল। এখন যেমন ২০২২ সাল (ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে), আবার এই সাল একবিংশ (২১শ শতক)। আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। সেটা ছিল বিংশ শতক (২০শ শতক বা শতাব্দী)। দশ বছরকে বলে দশক। পঞ্চাশ বছরকে বলে অর্ধ-শতক। প্রতি একশ বছরকে বলে শতক বা শতাব্দি। প্রতি হাজার বছরকে বলে সহস্রাব্দ। অনেক আগের ইতিহাস জানতে হলে হয়তো আমাদের কয়েক লক্ষ বা কয়েক মিলিয়ন বছরের ইতিহাসও জানতে হয়। কিছু দিন আগে পর্যন্তও যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পরের সময়কে ইংরেজি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে বলা হতো খ্রিষ্টাব্দ আর জন্মের আগের সময়কে বলা হতো খ্রিষ্টপূর্বাব্দ বা খ্রিস্টপূর্ব সময়। ধরো বাংলাদেশের বগুড়ায় মহাস্থানগড় নামের যে পুরোনো ঐতিহাসিক স্থানটি রয়েছে সেখানে মানুষ প্রথম বসতি তৈরি করেছিল খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে। এখন (বর্তমানকাল) থেকে হিসাব করলে সেই বসতি প্রায় ২৩০০-২৪০০ বছরের পুরনো। এখন খ্রিষ্টাব্দ বা খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের পরিবর্তে সাধারণ অব্দ বা সাধারণ পূর্বাব্দ বলা হয়ে থাকে সময় গণনায়। সাধারণ অব্দ গণনার যে ক্যালেন্ডার, তার শুরুও যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পর থেকে। আর সাধারণ পূর্বাব্দ তাঁর জন্মের আগের। এই ক্যালেন্ডার পৃথিবীর সব দেশেই অনুসরণ করা হয়। কারণ, অনেক সময় একেক দেশে একেক ক্যালেন্ডার থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সময় গণনা করলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমস্যা হতে পারে।

যেমন ব্রিটিশরা আমাদের দেশ দখল করে যখন শাসন করেছিল, তার শুরু হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধে। সে সময়ে

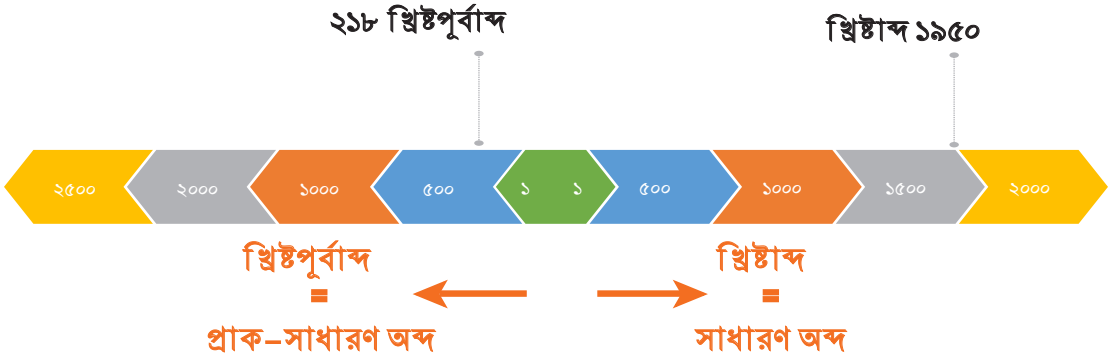

কিন্তু বাংলাদেশ নামে কোনো আলাদা দেশ ছিল না। তখন বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত, ও পাকিস্তান মিলে ছিল ভারতবর্ষ বা ভারত উপমহাদেশ। মোগল সম্রাট বা শাসকগণ ছিলেন ক্ষমতায়। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা আর বিহার শাসনের জন্য মোগল সম্রাট নিয়োগ করেছিলেন যাকে, তিনি নবাব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। তাকে সেই সময়ের ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামের একটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা অন্যায়ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে হারিয়েছিল। সেই যুদ্ধ ঘটেছিল পলাশী নামের একটা জায়গায়। সেই জায়গাটি এখনকার ভারতের পশ্চিমবাংলার নদীয়া জেলায় অবস্থিত। তখন তাহলে ছিল অষ্টাদশ (১৮শ শতক)। সেই যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে সেই সময়ের বাংলা (আজকের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলা মিলে ছিল বাংলা), বিহার ও উড়িষ্যা দখল করে নিজেদের পছন্দের একজনকে নবাব বানিয়ে দিয়েছিল। তারপরে কয়েক বছরের মধ্যে পুরো ভারত উপমহাদেশ তারা দখল করে নিল। পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। সেই সাম্রাজের পতন হলো ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো আলাদা দেশ তৈরি হলো। বাংলাদেশ তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশের নাম তখন হলো পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানি শাসকেরা ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপরে নানা অত্যাচার, অবিচার আর নিয়ন্ত্রণ শুরু করলে সেই শাসনের শেষ হলো ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

স্থান ও কালের ভিন্নতা এবং ইতিহাসের ভিন্নতা : দেশ, কাল ও যুগ

ওপর বিভিন্ন সাল ধরে যে বর্ণনা তোমরা পড়লে, তার ওপর ভিত্তি করে যদি আমরা যুগকে ভাগ করতে চাই, কীভাবে করতে পারি? সময়ের অনুক্রম ধরে। আমরা ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কে বলতে পারি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ (কারণ, আমাদের দেশ বাইরের একটা দেশ দখল করে শাসন করে বলে আমাদের দেশ সেই দেশের উপনিবেশ ছিল)। কেউ কেউ এই যুগকে বলেন আধুনিক যুগ। তারা মনে করেন, ব্রিটিশরা উপনিবেশ তৈরি করে বেশ কিছু আধুনিক (ভালো অর্থে নয়) ধারণা ও চর্চা আমাদের মধ্যে প্রচলিত করেছিল। আবার এই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ ছিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ছিল পাকিস্তান আমল বা পরাধীনতার যুগ। পাকিস্তানিরাও আমাদের দেশের ছিল না। তাই এই যুগকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক যুগও বলা হয়। ১৯৭১ সাল মুক্তিযুদ্ধের সাল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে আজ অব্দি স্বাধীন বাংলাদেশ আমল বা স্বাধীনতার যুগ। উপনিবেশ বিলুপ্ত হওয়ার কারণে কেউ কেউ ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজ অব্দি সময়কে বলেন উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগ বা আমল বা ব্রিটিশ উপনিবেশ পরবর্তী যুগ।

এবার মজার একটি খেলা!

উপরের বর্ণনায় সময় বিষয়ক অনেকগুলো ধারণা আলোচিত হয়েছে। যেমন দশক, যুগ, কাল, শতাব্দী, সহস্রাব্দ প্রভৃতি। তোমার পক্ষে যতগুলো সম্ভব অর্থসহ শব্দগুলো নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো। এবার তোমার আশপাশে বন্ধু, সহপাঠী, সমবয়সী বা বড় ভাই-বোন, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন যাদের সঙ্গে সম্ভব, তাদের সবার সঙ্গে এগুলো নিয়ে ধাঁধাঁ বা কুইজ প্রতিযোগিতা করতে পারো। নিচে দেখানো ছকের মতো একটি ছক করে নিতে পারো যতোগুলো ঘর প্রয়োজন ততোগুলো ঘর দিয়ে বা নিজের মতো করে অন্য কোনো ছকও করতে পারো।

ক্রম	সময় বিষয়ক শব্দ/ধারণা	শব্দ বা ধারণার ব্যাখ্যা
১.	দশক	১০ বছর সময়
২.	যুগ	
৩.	শতক	
৪.	সাধারণ পূর্বাব্দ	
৫.	----	

পৃথিবীর ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান

ত্রিমাত্রিক চিত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান

বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ভূমির বৈশিষ্ট্য এই চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে তোমার বাড়ি ও স্কুল কোন ভূমিরূপের উপরে অবস্থিত? এই চিত্র দেখে তোমাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে? তোমার বাসার কাছের নদীর নাম জানো?

লক্ষ করে দেখো স্থান বা দেশের নাম ও সীমানা একেক যুগে একেক রকম ছিল। ব্রিটিশরা দখল করে নেওয়ার আগে ছিল মোগল আমল বা মোগল যুগ। তখন আজকের বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তান ছিল মোগল রাষ্ট্র অথবা একটা দেশ বা একটা রাজ্য নামে পরিচিত অঞ্চল। বাংলা ছিল সেই দেশের একটা প্রদেশ (তখনকার নাম ছিল সুবা)। ব্রিটিশরা উপনিবেশ তৈরি করার পরে তারা ওই উপনিবেশকে নাম দিল ভারত বা ইন্ডিয়া। শ্রীলঙ্কা দেশটি এবং বর্তমান মিয়ানমারের কিছু অংশও সেই উপনিবেশ দেশের মধ্যে ছিল। ইউরোপ বা আমেরিকায়; কিন্তু বাংলাদেশের পরিচয় তখন ব্রিটেন। কারণ, ব্রিটেনের রাজা বা রানি এই দেশের প্রধান ছিলেন।

ব্রিটিশরা নিজেদের দেশের মতন নতুন নতুন আইনকানুন, বিচারব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করল। ১৯৪৭ সালের পরে দুটি দেশ হলো– ভারত ও পাকিস্তান। আমাদের দেশের নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালের পরে আমরা পেলাম স্বাধীনতা। আমাদের দেশের নাম হলো বাংলাদেশ।

তাহলে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে একটা স্থান বা দেশই বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে পারে। তার সীমানা পাল্টাতে পারে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানের নাম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। নিচে ইতিহাসে প্রচলিত কয়েকটি যুগ ও সময়কাল উল্লেখ করা হলো। মনে রাখবে অনেক কাল বা সময় যুগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুরু ও শেষ হয়।

এই ইতিহাস জানার জন্য যারা ইতিহাস বলেন ও লেখেন, তারা বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহার করেন। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে আগের দিনের লেখা বই, দলিল, নথিপত্র। বিভিন্ন ধরনের বস্তু। বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের উপাদান। আবার মানুষ লেখা আবিষ্কার করার আগের সময়ের জন্য ইতিহাসবিদগণ ওই সময়ের মানুষের তৈরি বা ব্যবহার করা পাথর, লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ, হাড় ও কাঠের তৈরি বস্তুর সাহায্য নেন। মানুষ যখন গুহায় থাকতো, শিকার ও সংগ্রহ করতো, এক জায়গায় বসবাস করতো না। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গা

থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতো, শিকার করতো, তখনকার যুগকে বলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ। শব্দটি এসেছে প্রাক্ ও ইতিহাস থেকে। ইতিহাসে যেহেতু একসময় পর্যন্ত মানুষের লেখা বিভিন্ন ধরনের নথি বা বই বা তামার পাত বা পাথরের টুকরা বা মাটির খণ্ডকেই একমাত্র ইতিহাস জানার উৎস বলে মনে করা হতো, তাই ইতিহাসের আগের যুগকে প্রাক-ইতিহাস বা প্রাগিতিহাস নামে ডাকা শুরু হয়। এই সময়ের শুরু তিন বা তারও বেশি মিলিয়ন বছর আগে। আর যখন মানুষ লিখতে শুরু করলো, তখন শুরু হলো ইতিহাস। যেমন মিসরীয় সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতার মানুষজন লিখতে জানতো। তাদের লেখার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। সময়ের শুরু ও শেষও ভিন্ন ভিন্ন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগকে আবার কয়েকটি যুগে ভাগ করা হয়– প্রধানত মানুষের তৈরি ও ব্যবহার করা বিভিন্ন নিদর্শনের কাঁচামালের উপরে ভিত্তি করে। একটা দীর্ঘ সময় মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাথরের, জীবাশ্মের বা হাড়ের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে শিকার করার জন্য। মাছ ধরার জন্য। শিকার করা প্রাণীর শরীর থেকে মাংস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য। বিভিন্ন জায়গার পরিবেশ, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, বরফের প্রভাবে মানুষের এসব হাতিয়ারেও পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ তার নড়াচড়ায় কাছাকাছি যেসব উপযুক্ত উপাদান বা কাঁচামাল পেয়েছে, তা দিয়েই হাতিয়ার তৈরি করছিল। প্রধান উপাদান ছিল বিভিন্ন ধরনের পাথর। তাই প্রাগিতিহাসের শুরুর যুগকে বলা হয় প্রস্তর যুগ। তারপরে মানুষ তামা ও পাথর ব্যবহার করেছে। সেই যুগকে বলা হয় তাম্রপ্রস্তর যুগ। সেই যুগের পরে মানুষ পৃথিবীর কিছু জায়গায় সভ্যতা তৈরি করেছে। তখন মানুষ ব্যবহার করতে শিখেছে ব্রোঞ্জ ধাতুটি। শহর তৈরি করতে শিখেছে। লিখতে শিখেছে। পরিকল্পনা করে জমির পরিমাপ করতে শিখেছে। বড় বড় স্থাপনা নির্মাণ করতে শিখেছে। সমুদ্রপথে জাহাজে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শিখেছে। এই যুগকে তাই কোনো কোনো অঞ্চলের ক্ষেত্রে সভ্যতার যুগও বলা হয়। ধরো বর্তমান মিসরে কিংবা বর্তমান ইরান-ইরাকে বা বর্তমান পাকিস্তানের কিছু অংশ ও ভারতের পশ্চিমের কিছু অংশে যখন সভ্যতা তৈরি হচ্ছে, তখন কিন্তু অন্য কোনো অঞ্চলের মানুষ বসবাস করছে। অথবা তাম্রপ্রস্তর যুগে বসবাস করছে। কারণ, পৃথিবীর একেক জায়গায় মানুষ একেকভাবে নিজের, সমাজের ও প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাই সকল জায়গার ইতিহাসও একরকম নয়। ইতিহাস জানার উপাদান ও যুগও এক নয়। প্রস্তর যুগকেও আবার তিনটি পর্ব বা যুগে ভাগ করা হয়। পাথরের হাতিয়ারের মাপ, ধরন ও প্রকারের উপরে ভিত্তি করে। মানুষের বেঁচে থাকার, খাদ্যাভ্যাসের, জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে। এই তিনটি যুগ হলো–উচ্চ পুরোপলীয় যুগ (বা প্রত্নপ্রস্তর যুগ), মধ্য পুরোপলীয় যুগ আর নিম্ন পুরোপলীয় যুগ। পলীয় শব্দটা এসেছে পাথর থেকে। পুরোপলীয় যুগের পরে আসে মধ্যপলীয় যুগ। পরের নব্যপলীয় যুগে মানুষ প্রথম স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে, কৃষিকাজ ব্যাপকভাবে শুরু করে আর বহু জায়গায় পশুপালন করতে শেখে।

নব্যপলীয় যুগের পরেই মানুষ প্রথম ধাতুর ব্যবহার শেখে, তখন তামার ব্যবহার শুরু করে হাতিয়ার তৈরিতে। পাথরের ব্যবহারও চলতে থাকে। তাই এই যুগকে বলে তাম্রপ্রস্তর যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার প্রথম আদি পর্যায় শুরু হয় তাম্রপ্রস্তর যুগের শেষে; আর পুরোপুরি সেসব স্থানে নগর কেন্দ্রভিত্তিক সভ্যতা গড়ে ওঠে ব্রোঞ্জযুগে।

তারপরে মানুষ ধীরে ধীরে অন্যান্য ধাতুর ব্যবহারও শুরু করে। এসব ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহার করতে শেখাটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান ভারত উপমহাদেশে ১২০০-১০০০ পূর্বাব্দে মানুষ লোহার ব্যবহার করতে শেখে। কেউ কেউ এই যুগকে লৌহ যুগও বলে থাকেন।এই লৌহযুগেই বিভিন্ন স্থানে লিখিত বিভিন্ন উপাদান পাওয়া শুরু হয়। পাথরে, গুহায়, তামার পাতে যেমন লেখা শুরু করে মানুষ, তেমনি তালপাতা বা কাপড়েও লেখা শুরু করে। কাগজ তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ভারত উপমহাদেশে প্রাগিতিহাস পার হয়ে ইতিহাসের যুগের শুরু হয়। ষষ্ঠ সাধারণ পূর্বাব্দে ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয় বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন। এই ইতিহাসের যুগকে কেউ কেউ সেই সময়ের রাজা বা শাসকদের বংশের নামে ডাকেন। কেউ বলেন, রাজাদের বংশের নামে যুগের

নাম না হয়ে এমন কোনো নাম হোক, যা সকল মানুষের ইতিহাসের কথা বলবে। তাই মৌর্য বংশের নামে মৌর্য যুগ, গুপ্ত রাজবংশের নামে গুপ্ত যুগ, পাল রাজবংশের নামে পাল যুগ, সুলতানদের শাসনকালকে সুলতানী যুগ, মোগল রাজবংশের শাসনামলকে মোগল যুগ ডাকা হয়। আবার অন্যরা প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও ব্রিটিশ যুগ বা আধুনিক যুগ বলে থাকেন। বাংলাদেশের ইতিহাস লেখায় প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক বা ব্রিটিশ যুগ বলা হয় একদিকে; আবার, পাল আমল বা যুগ, সুলতানী আমল বা যুগ বা মোগল আমল বা যুগও বলা হয়। সাধারণ পূর্বাব্দ ষষ্ঠ শতক থেকে শুরু করে সাধারণ ত্রয়োদশ বা ১৩শ শতক অব্দি প্রাচীন যুগ বলে ধরা হয়। আবার ১৩ শতক থেকে ১৮ বা অষ্টাদশ শতক অব্দি মধ্য যুগ বিবেচনা করা হয়। মনে রাখবে, যেকোনো যুগের শুরু ও শেষ কিন্তু সব স্থানে এক নয়। ইতিহাস যারা জানার চেষ্টা করেন তারা নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুগের শুরু ও শেষও নতুন করে চিন্তা করার কথা বলেন। অন্য সকল বিষয়ের মতন ইতিহাস লেখাও বদলাতে থাকে। নতুন নতুন তথ্য, দলিল বা নিদর্শন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছু জানা পুরোনো জানা অনেক কিছুকে ভুল প্রমাণ করে।

তবে ক্যালেন্ডারের বা কালপঞ্জির এই ভিন্নতা কিন্তু অতীতেও ছিল অন্যভাবে। ভারত উপমহাদেশে একেক জায়গায় একেক সময় এক এক ধরনের ক্যালেন্ডার বা বছর গণনার রীতি চালু করা হয়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাসকদের নামে বছর গণনার রীতি প্রচলন করার প্রচেষ্টা ছিল। এই রীতি কোনো শাসকের মৃত্যুর পরে বা রাজবংশের পতন ঘটলে অচল হয়ে পড়ত। কিন্তু অনেক নথি ও লিখিত উৎসে এমন বছর গণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা অঞ্চলেই শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, বিক্রমাব্দ, মল্লাব্দ ইত্যাদি। তারপরে মুসলমান, বৌদ্ধ আর হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আলাদা আলাদা দিনপঞ্জি রয়েছে। এক ধরনের দিনপঞ্জিকে পঞ্জিকা বলা হয়ে থাকে। তোমরা একটু খোঁজ করলেই পঞ্জিকা দেখতে পাবে। সেখানে সময় গণণার রীতি কিন্তু আমাদের ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ডের থেকে আলাদা।

চলো টাইম লাইন তৈরি করি

উপরে আমরা যে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের টাইম লাইন দেখলাম, চলো আমরাও আশেপাশের বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমাদের পরিবারের বা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা অতীত ইতিহাস জেনে নিজেদের মতো করে আমাদের পরিবার বা এলাকার ইতিহাসের বা পরিবর্তনের একটি টাইম লাইন তৈরি করি।

মরুভূমি

আমরা তো জানলাম, প্রাচীন মানুষেরা মরুভূমিসহ বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করত। কিন্তু মরুভূমি আসলে কী, দেখতেই বা কেমন? তা কি আমরা জানি? আমরা অনেকেই হয়তো মরুভূমির কথা আগেও জেনেছি, অনেকে হয়েতো এই প্রথম শুনলাম। মরুভূমি নাম শুনলেই চোখের সামনে আসে শুধু ধু ধু বালির প্রান্তর তাই না! তবে শুধু বালি নয় পাহাড়, মালভূমি, বালি, অনুর্বর ভূমি প্রভৃতিই হলো মরুভূমি গঠনের মূল উপাদান। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা আরোও আছে কালাহারি, অ্যারিজোনা ও আরব দেশগুলোর মরুভূমি। পৃথিবীর এই ভূমিরূপের সৃষ্টিও হয় এক বিস্ময়করভাবে। সাধারনত বেশি দেখা যায় ক্রান্তি অঞ্চলে

মরুভূমি বসবাসের জন্য অত্যন্ত অনুপযোগী। মরুভূমির দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি হয়। দিনে তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায় রাতে সেই তাপমাত্রা অনেক কমে যায়।

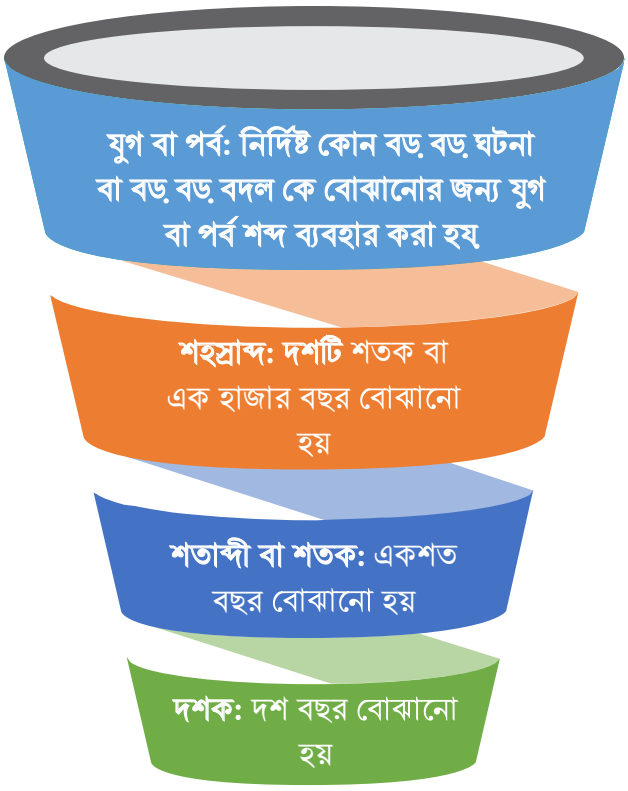

সময়ের মাপজোখ : ইতিহাসে আমরা আগে বা পরে বলতে পারি। কোনো ঘটনার আগে বা পরে বলেও আমরা সময় প্রকাশ করতে পারি। তবে ইতিহাসবিদগণ অতীত সময়কে প্রচলিত ক্যালেন্ডার অনুসারে পরিমাপ করতে গিয়ে কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করেন। কখন ঘটেছিল? – এই প্রশ্নের উত্তরের পাশাপাশি কী, কোথায়, কেন ও কীভাবে ঘটেছিল সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজাও ইতিহাসের কাজ।

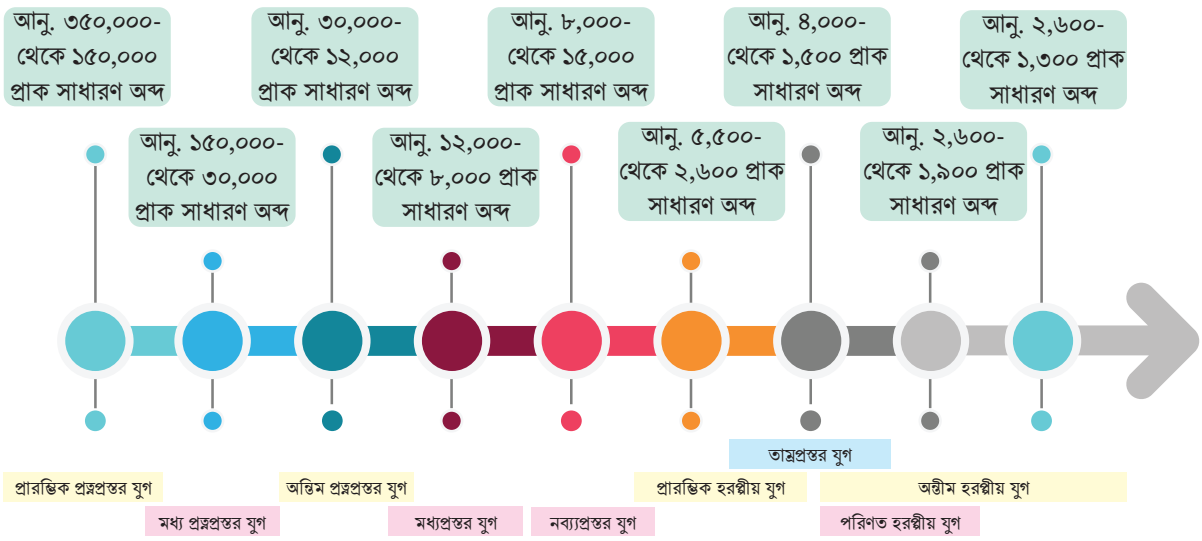

বিভিন্ন ধরনের উপাদান ও ইতিহাস

আগেই আমরা জেনেছি যে বিভিন্ন উপাদান ও উৎস থেকে ইতিহাস জানা যায়। ইতিহাস কেবল রাজা-বাদশাহদের জীবন কাহিনি নয়, তাদের সফলতা, যুদ্ধজয় অথবা রাজত্ব বিস্তারের বিবরণ নয়। ইতিহাস হতে পারে নানা ধরনের। কোনো ধরনের ইতিহাস জানা ও লেখা হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে কী ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। কোন কোন ধরনের উপাদান-উৎস ইতিহাস জানার জন্য ব্যবহার করা হবে। ইতিহাস জানার ও লেখার জন্য সব ধরনের পক্ষপাত থেকে দূরে থাকতে হয়। যে সকল উপাদান ও উৎস থেকে ইতিহাস জানার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। সেগুলোতে কারও কোনো পক্ষপাত বা নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হয়েছে কি না, যাচাই করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য আর উপাদানের উপরে নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকারের ইতিহাস জানা ও লেখা যায়। যেমন :

পোড়ামাটিতে খোদাই করা লিপি। এই লিপি একটি দিনপঞ্জিও বটে। এটি প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় ব্যবহার করা হতো।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস : সমাজে মানুষ কীভাবে বসবাস করতো, তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমাজের নানা উপাদানের অতীত বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন যখন বোঝার যখন চেষ্টা করা হয় তখন সামাজিক ইতিহাস হয়ে ওঠে। একইভাবে যখন মানুষের নানান পরিচয়, গোত্র, পরিবার, গোষ্ঠী, বসবাসের এলাকা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচরণ ও একদল মানুষের সঙ্গে আরেক দল মানুষের সম্পর্কের অতীত ও পরিবর্তন নিয়ে ইতিহাস জানা হয়, তখন সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা হয়। ইতিহাস যারা জানার ও লেখার চেষ্টা করেন, তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অতীতকালের বিভিন্ন উৎস ও উপাদান খুঁজে বের করেন। সেগুলোর ভিত্তিতে তারা অতীতে সমাজ ও সংস্কৃতি কেমন ছিল তা জানার চেষ্টা করেন।

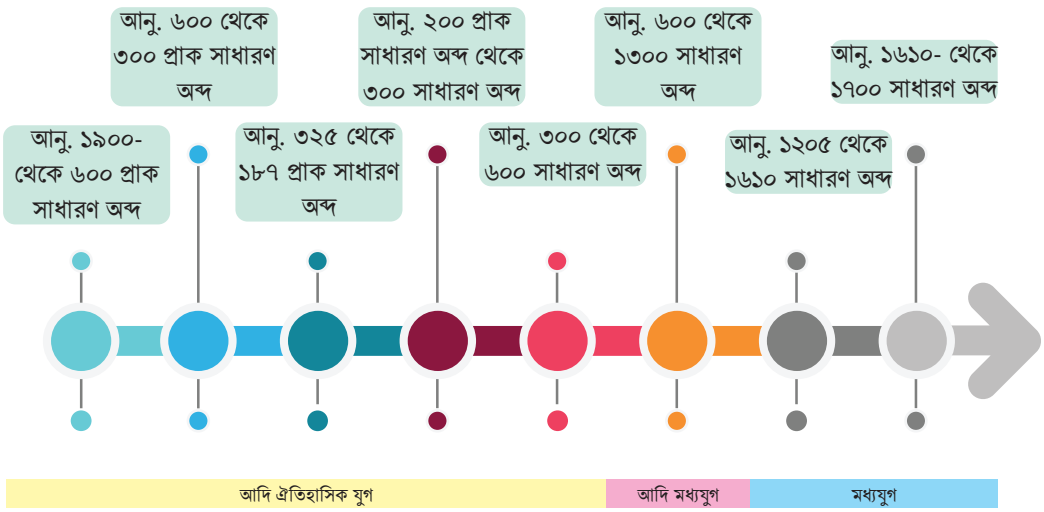

রাজনৈতিক ইতিহাস : মানুষ অতীত থেকেই যেমন একসঙ্গে বসবাস করেছে, তেমনই একে অপরের সঙ্গে বিরোধে ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। শাসকগণ একসময় রাজা, সম্রাট, বাদশাহ, মহাসামন্ত, প্রভু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তারা মানুষকে শাসন করতেন। নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করতেন। এক এলাকার মানুষের সঙ্গে অন্য আরেক এলাকার মানুষের বিরোধ ছিল। এক পরিচয়ের মানুষের সঙ্গে আরেক পরিচয়ের মানুষের যোগাযোগ ছিল। অতীতে শাসক ও শাসিতদের সম্পর্ক কেমন ছিল, রাজা ও প্রজাদের সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানা যায় রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে। এই ইতিহাস জানা ও বোঝার জন্য পুরোনো লিখিত বিভিন্ন ধরনের উপাদান, দলিল, বিবরণীর পাশাপাশি মানুষের ব্যবহার করা বিভিন্ন নিদর্শন, স্থাপনাসহ নানা উপাদান এই ইতিহাস জানার জন্য ব্যবহার করা হয়।

তামার পাতে খোদাই করা লিপি (তাম্রলিপি বা তাম্রপট্ট)

অর্থনৈতিক ইতিহাস: মানুষ একসময় ধাতব ও কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করতো না। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন শস্য, দ্রব্য ও জিনিসপত্র বিনিময় করতো। নানা ধরনের উপাদান মুদ্রা হিসেবে একসময় ব্যবহৃত হতো। আবার প্রজাদের কাছ থেকে রাজা বা জমিদারগণ রাজস্ব ও খাজনা আদায় করতেন। এক দেশের বা এক এলাকার সঙ্গে আরেক দেশের ও আরেক অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো স্থলপথে, জলপথে ও সমুদ্রপথে। এসব বিষয় নিয়ে যে ইতিহাসে আলাপ করা হয়, সেই ইতিহাসই অর্থনৈতিক ইতিহাস।

পাহাড়ের গুহার মধ্যের দেয়ালে খোদাই করা লিপি

পরিবেশের ইতিহাস: মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অতীতে কেমন ছিল তা জানা ও বোঝার চেষ্টা করা হয় পরিবেশের ইতিহাসের মাধ্যমে। পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান রয়েছে। প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, মাটি, পাথর, নদী, পানি ইত্যাদি একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষ এসব উপাদানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে, এসব উপাদান ব্যবহার করে উন্নতি করেছে। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে, প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগতের বদলের কারণে। এসব জানাই পরিবেশের ইতিহাসের লক্ষ্য।

তালপাতায় লেখা পুরোনো চিত্রিত পাণ্ডুলিপি

কথ্য ইতিহাস : মানুষের জীবনের অনেক কথাই লিখিত হয়নি। অনেক কথা মানুষ নানা কাহিনি, কিংবদন্তি, লোক প্রবাদ, গল্প হিসেবে মনে রাখেন। এগুলো মানুষের স্মৃতিতে থাকে। ইতিহাস জানার জন্য বিভিন্ন

আবহাওয়া : কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের অর্থাৎ ১ থেকে ৭ দিনের বায়ু, তাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির গড় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। জলবায়ু : কোনো স্থানের ৩০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়া অর্থাৎ বায়ু, তাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির গড়কে জলবায়ু বলা হয়)

চকচকে প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রের টুকরা

মানুষের সঙ্গে আলাপ করে তাদের স্মৃতি ও গল্প সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছ থেকে ওই এলাকার বিভিন্ন গল্প, কাহিনি, কিংবদন্তি, রূপকথা, প্রবাদ সংগ্রহ করা হয়। লোকমুখে শুনে শুনে, এই ধরনের কথ্য বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনি সংগ্রহ করে অতীতের এমন অনেক ইতিহাস জানা সম্ভব হয়, যা অনেক সময় লিখিত বিভিন্ন উপাদানে পাওয়া যায় না।

ছোট আকারের চিত্র

এমন নানা ধরনের ইতিহাসের পাশাপাশি কোনো একটি বিশেষ এলাকা বা অঞ্চলের বা দেশের ইতিহাসও লেখা হয়ে থাকে। মানুষ বিভিন্ন সময় কৃষিকাজ করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করেছে। সেই উৎপাদনের ধরন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। মানুষ পশুপালন করেছে। শিকার করেছে– এমন বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কৃষি ও শিল্পর ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে। উৎস হিসেবে যেমন লিখিত উপাদান ব্যবহার করা হয়, তেমনই মাটির ইতিহাস, উদ্ভিদের ও প্রাণীর জীবাশ্ম, চাষাবাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু, শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদিত দ্রব্য অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করেন গবেষকগণ। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। অতীতকালের নানান দলিলপত্র জাদুঘর ও সংগ্রহশালা/ মহাফেজখানায় সুরক্ষিত থাকে। সেখানে গবেষকগণ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে মানুষের, প্রকৃতির, পরিবেশের, বিজ্ঞানের ধরন অতীতে কেমন ছিল তা জানার চেষ্টা করেন।

পুরোনো বাংলা হরফে লেখা পুঁথি

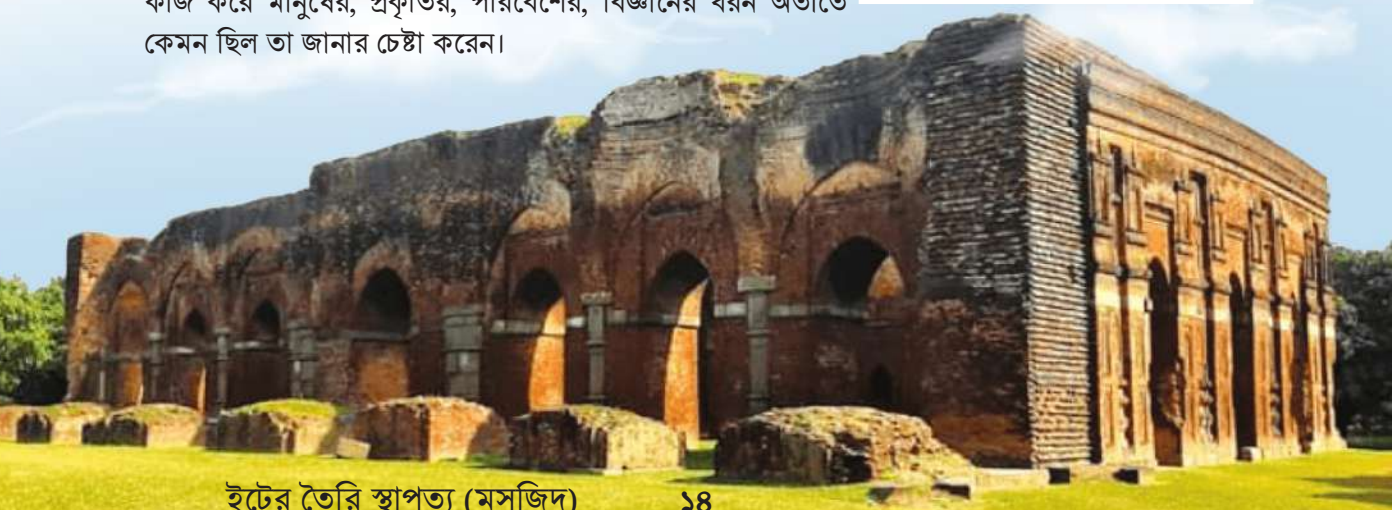

ইটের তৈরি স্থাপত্য (মসজিদ)

অনেক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। সেগুলো খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগে। ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হয়। ইতিহাস জানা ও বোঝায় তাই প্রশিক্ষণ লাগে, মনোযোগ লাগে, ধৈর্য লাগে। উপাদান সংগ্রহ ও বোঝার জন্য শিখতে হয় আলাদা করে। ইতিহাস বদলাতেও থাকে নতুন নতুন তথ্য ও উপাদান আবিষ্কৃত হলে। সত্য ও প্রমাণনির্ভর ইতিহাস তাই নতুন, নতুন উপাদান ও উৎস খুঁজে পাওয়ার উপরেও নির্ভর করে।

পোড়ামাটির খেলনা

পোড়ামাটির, ধাতুর আর পুঁতি দিয়ে তৈরি অতীতের অলংকার

পাথরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্য

পাথরের হাতিয়ার, মুদ্রা আর মৃৎপাত্রের টুকরা

দেয়ালের গায়ে অঙ্কিত চিত্র।

পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত চিত্র

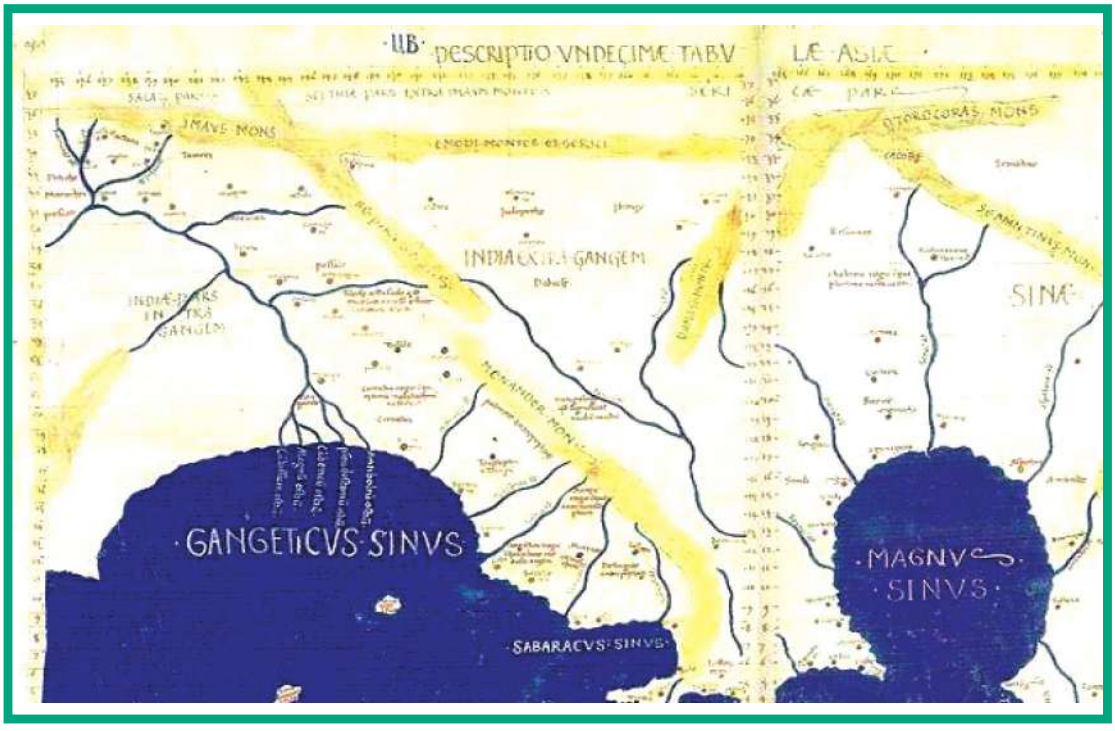

পুরোনো সময়ের মানচিত্র

মহাফেজখানায় পুরোনো দিনের ফটোগ্রাফ আর নথি নিয়ে গবেষণা করে ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায়।

অতীতের প্রাণীর হাড়ের জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে সে সময়ের পরিবেশ, প্রাণিজগৎ, খাদ্যাভ্যাসসহ অনেক কিছু জানা যায়।

মানুষের কঙ্কাল ও বিভিন্ন ধরনের হাড় ও দাঁতের জীবাশ্ম খনন করে খুঁজে বের করা হয়। মানুষের প্রজাতি, কবর দেওয়ার রীতি, কবরে উৎসর্গ করা বস্তু, অতীতের রোগবালাই, খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্য ও বসতি সম্পর্কে জানা যায়।

পুরোনো পত্রিকা

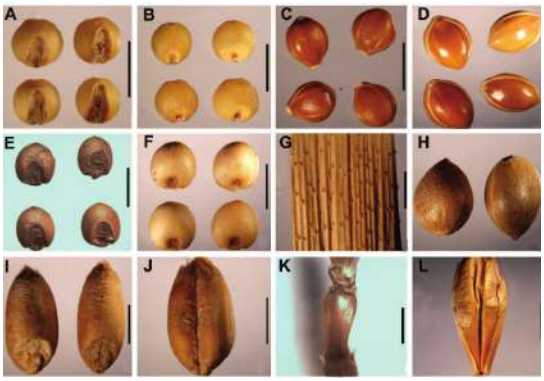

অতীতের উদ্ভিদ, বীজ, পরাগরেণুসহ বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ খুঁজে বের করে গবেষণা করে অতীত পরিবেশ, মানুষের খাদ্যাভ্যাস, কৃষিকাজ, জীবনযাপনের ইতিহাস জানা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করে বিভিন্ন নিদর্শন খুঁজে বের করা হয়। সেগুলোর ভিত্তিতে ইতিহাস জানা যায়।

পুরোনো নথিপত্রকে ছবি তুলে মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয় মহাফেজখানায়।

পুরোনো নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি ও দলিল সংগ্রহ আর সংরক্ষণ করে রাখে মহাফেজখানায়

কেন ইতিহাস জানা ও লেখা দরকার?

অনেকে তোমাদের বলতে পারেন অতীতের কথা ভুলে যাও। ইতিহাস জেনে কোনো লাভ নেই। ইতিহাস জেনে টাকা-পয়সা পাওয়া যায় না। কিন্তু তারা ভুল বলবেন। ইতিহাস জানা যেকোনো মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজন। কোনো মানুষ যদি তার ও তার মতন অন্যান্য মানুষ আর প্রকৃতির ইতিহাস না জানে, তাহলে বর্তমানে সেই মানুষের বা মানুষদের কোনো নিজস্ব পরিচয় থাকবে না। আমাদের দেশ ও জাতির অতীত সম্পর্কে জানা দরকার। কারণ, একদল মানুষ মিলেমিশে কখনো বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে, কখনো মিথ্যা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কখনো নতুন কোনো আবিষ্কার করে এমন সব ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, যা আমাদের বর্তমানকে তৈরি করেছে। মানুষের যদি স্মৃতি না থাকে, তাহলে সেই মানুষের বেঁচে থাকা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। ইতিহাস আমাদের সকলের সমষ্টিগত স্মৃতিকে খুঁজে বের করে। আমরা অতীতে যদি কোনো ভুল করে থাকি, কোনো খারাপ কাজ করে থাকি তা জানলে ভবিষ্যতে সেই ভুল বা খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারি। আর যদি কোনো অহঙ্কার করার মতন ভালো কাজ করি, তাহলে সেই কাজের ইতিহাসে আমাদের প্রেরণা দেবে।

বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন করার পাশাপাশি সেগুলো নিয়ে গবেষণাও করা হয় জাদুঘরে।

চলো এবার আমরা কয়েকটি কাজ করি!

১. প্রথমে এখানে আমরা ইতিহাস জানার জন্য প্রচলিত ও অপ্রচলিত যে সকল উৎস ও উপাদানের কথা জানতে পারলাম তার একটি তালিকা তৈরি করি এবং বন্ধু ও আশপাশের মানুষ যারা আছে, তাদের সঙ্গে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

২. পরিবার ও আশপাশের মানুষের সহযোগিতায় ইতিহাস জানা যায় বা অতীতের তথ্য পাওয়া যায় এমন উপাদানগুলো সংগ্রহ করে স্কুলের শিক্ষকের সহযোগিতায় সকল সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুলে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারো।

৩. তোমার এলাকায় কোনো পুরোনো স্থাপনা, অতীতের ব্যবহার সামগ্রী, পোশাক, ছবি, বই, ডায়েরি, পাণ্ডুলিপি, গান, পুঁথি, সিনেমা , নাটক, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদি যে, কোনো কিছু ব্যবহার করে ওইসব উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে তোমার মতো করে ঐ স্থান/বিষয়/ বা জিনিসের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করতে পারো। এ কাজে প্রয়োজনে রিসোর্স বই, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বই, পত্র-পত্রিকা, ছবি, ইন্টারনেট, ইউটিউব থেকে বড়দের সহযোগিতায় তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। ইতিহাস লিখে সেটা তোমার পছন্দের কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকের সহযোগিতায় উপস্থাপন করতে পারো।

মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে?

উপরের প্রশ্নটা শুনলেই একটু অবাক হতে পারো। মানুষ আর সমাজ এলো- মানে কী? আমরা মানুষ তো এরকমই মানুষ। সবসময়। ইতিহাস কিন্তু সেই কথা বলে না। মানুষ ও সমাজের ধীরে ধীরে বদল হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের দৈহিক ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন, কথা বলতে পারা বা লিখতে পারা, চাষাবাদ করা, শিকার করা ইত্যাদি সবকিছুই অনেক, অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। সেই পরিবর্তনের ফলেই আজ আমরা মানুষ। এই ইতিহাস কিন্তু অনেক লম্বা, লক্ষ লক্ষ বছরের। মানুষ নিয়ে আলাপ প্রসঙ্গে আমরা শুরু করতে পারি আনুমানিক ৩.৩ মিলিয়ন (প্রায় ৩৩ লক্ষ) বছর আগে থেকে। যখন মানুষের যাত্রা শুরু হলো। সেই সময়ে কিন্তু মানুষ ছিল না। অনেকে বলেন, মানুষের উদ্ভব হয়েছে নাকি বানর থেকে। এ কথা ভুল। মানুষের এই লম্বা সময়ের ইতিহাস জানার জন্য অনেক ধরনের ইতিহাসবিদ বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাদের কেউ সেই সময়কার মানুষের পূর্বপ্রজন্মের কঙ্কাল বা শরীরের হাড়গোড়ের কয়েকটা অংশ আবিষ্কার করেছেন। এই হাড়গোড়গুলো হলো জীবাশ্ম বা ফসিল। তার জীবাশ্মবিজ্ঞানী। সঙ্গে থাকে জৈবিক নৃবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, জিনতত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভাষার ইতিহাসবিদ। এমন নানা পেশার পন্ডিতগণ অনেক বছর ধরে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

দুজন জীবাশ্মপ্রত্নতত্ত্ববিদ-জীবাশ্ম ইতিহাসবিদ যত্ন করে মানব কঙ্কালের জীবাশ্ম মাটি খুঁড়ে নথিভুক্ত করছেন। সূত্র: https://www.discovermagazine.com/planet-earth/when-is-it-ok-for-archaeologists-to-dig-up-the-dead)

মানুষের জীবাশ্ম নিয়ে আসা হয় গবেষণাগারে। সেখানে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জীবাশ্মের বয়স, লিঙ্গ, শরীরের অঙ্গসংস্থান, জৈবরাসায়নিক, অনুজীববিজ্ঞানগত, জিনতাত্ত্বিকসহ নানা বিষয় বিশ্লেষণ করেন। (উৎস : https://blogs.icrc.org/ir/en/icrc-in-iran/forensic-science/)

বিভিন্ন সময়ে মানুষের কঙ্কাল বা হাড়গোড় মাটির নিচ থেকে ইতিহাসবিদগণ উদ্ধার করেন। এসব হাড় হাজার হাজার বছর ধরে শক্ত হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় অনেক আর্দ্র জলবায়ুতে হাড় ক্ষয় পেতে পেতে বিলুপ্তও হয়ে যায়। পরিবেশের উপরে হাড় টিকে থাকবে কি না তা নির্ভর করে। এই ধরনের হাড় বা শরীরের টিকে থাকা অবশেষকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলা হয়।

মানুষের কঙ্কালের জীবাশ্ম বেশির ভাগ ক্ষেত্রের অংশবিশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। কেবল মাথার খুলির অংশ, চোয়ালের অংশ, মুখের হাড়ের অংশ কিংবা অন্য খণ্ডাংশ খুঁজে পাওয়া যায়। এই খণ্ডাংশের ওপরে ভিত্তি করেই জীবাশ্মের বয়স, লিঙ্গ. শরীরের গঠনসহ মানুষের বসবাসের পরিবেশ, চলাচল এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পুরো মানুষটির মুখ বা শরীর দেখতে কেমন ছিল তা-ও কম্পিউটারের সাহায্যে আঁকা যায়।

সেগুলো গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করেছেন। তারপরে মানুষের উদ্ভব থেকে এখন পর্যন্ত ইতিহাসকে অনেকটা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন। অনেক কিছু এখনো জানা বাকি। ইতিহাস জানা কখনো পুরোপুরি হয় না। সব সময়ই নতুন, নতুন আবিষ্কার হতে থাকে। আচ্ছা, আমাদের পূর্বপ্রজন্মের মানুষরা লক্ষ লক্ষ বছর আগে কি আসলেই বানর ছিল? নাকি পৃথিবীতে আমাদের আবির্ভাবই হয়েছে এখন যেমন আছি তেমন মানুষ হিসেবে! মানুষের আবির্ভাবের এবং পরিবর্তনের এই গল্পটা বরাবরই রহস্যময় এবং নানান প্রশ্নে জর্জরিত। কিন্তু বিভিন্ন পেশার গবেষক ও বিজ্ঞানী আর গবেষকগণের নিরন্তর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গত দশ বছরে এই রহস্যের জট অনেকটাই খুলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত অসংখ্য ফসিল বা জীবাশ্ম এই রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করেছে। কখনো শুধু দাঁত কিংবা চোয়ালের ফসিল, কখনো আবার পুর্ণাঙ্গ কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত ৬০০০ এরও বেশি এমন ফসিল বা জীবাশ্ম খুঁজে বের করা হয়েছে। সেগুলো মাটির নিচ থেকে যত্ন করে তুলে এনে গবেষণাগারে রেখে বছরের পর বছর গবেষণা করে নানান প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। যদিও এখনও আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি। ইতিহাসে কখনোই শেষ কথা বলে কিছু নেই। প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। প্রশ্ন না করলে নতুন নতুন চিন্তা কীভাবে আসবে? নতুন আবিষ্কার কীভাবে হবে? এই গল্পই অনেক ছোট করে অনেক ছবিসহ তোমাদের আজ আমরা বলব।

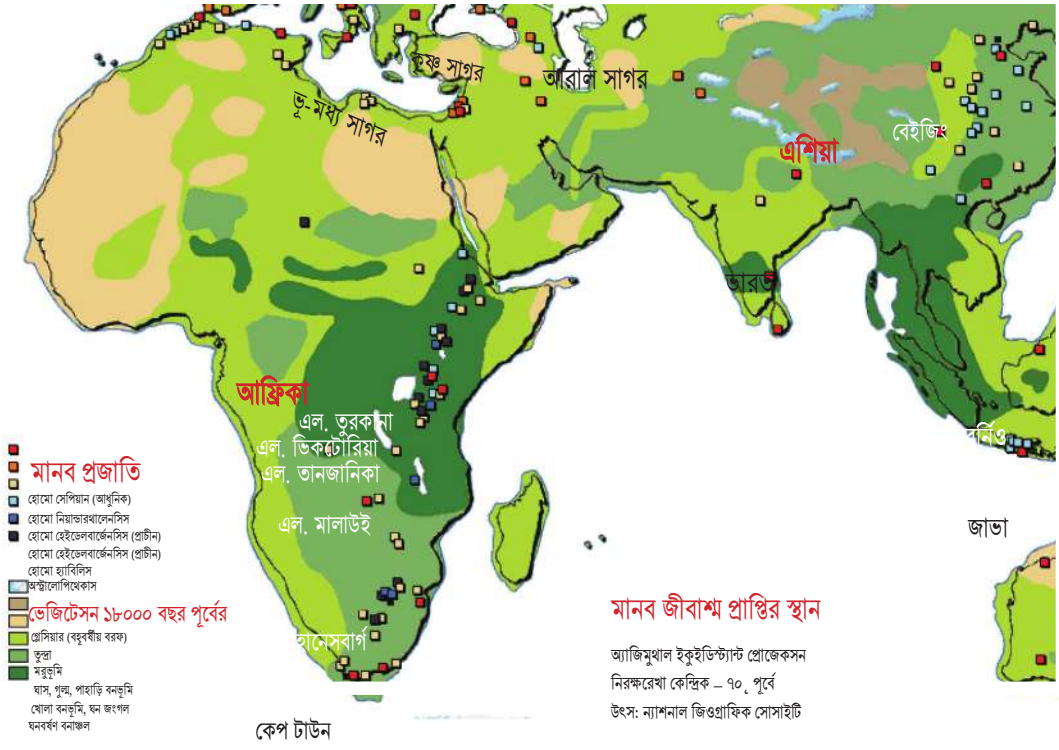

পৃথিবীর কয়েকটি স্থান যেখান থেকে মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইতিহাসে দীর্ঘসময়ের পথচলায় ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক মানব প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে। এই বিবর্তন পৃথিবীর নানা অঞ্চলে নানা সময়ে ঘটেছে।

আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে যে আধুনিক মানুষ এবং বানর-গোত্রের নানা প্রাণী (যেমন: শিম্পাঞ্জি, গরিলা) একটি সাধারণ প্রাইমেট জাতীয় প্রজাতি থেকে তাদের যাত্রা শুরু করেছে।

প্রাইমেট-জাতীয় প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে একদিকে শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং ও গিবনের মতন এপ-জাতীয় প্রাণীরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। অন্যদিকে, বানর তৈরি হয়েছে। আর একটি ধারায় মানুষ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে নানান পর্যায়ে। তোমাদের মনে রাখতে হবে, বানর বা শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষের উদ্ভব হয়নি। বরং মানুষ, শিম্পাঞ্জিসহ এপ-রা আর বানরের বিভিন্ন প্রজাতি একই ধরনের প্রাইমেট প্রজাতির প্রাণী থেকে বিকশিত হয়েছে। এই বিকাশে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লেগেছে।মানুষের এই বিবর্তন বা রূপান্তর হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। এই পরিবর্তনে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে জলবায়ুর বড় বড় পরিবর্তন। পরিবেশের বদল। গত লক্ষ লক্ষ বছরে বেশ কয়েকবার পৃথিবীর প্রায় পুরোটাই বরফে ঢেকে গিয়েছিল। এই হিমশীতল সময়কে বলা হয় বরফ যুগ বা আইস এজ।মানুষের পূর্বপ্রজন্মপলা সকল প্রজাতিকে একত্রে এপ বলা হয়।

বরফ যুগ

২৫ লাখ বছর আগে বিশালাকার বরফের পাহাড়ে ঢাকা ছিল পৃথিবী। বরফে ঢাকা শীতল এ সময়টিকে বরফ যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিজ্ঞানীরা জানান, অ্যান্টার্কটিকার বরফ ধীরে ধীরে বাড়ছে। অ্যান্টার্কটিকায় জমতে থাকা এ বরফ সমুদ্রের ওপর ঢাকনার মতো কাজ করছে। এতে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই -অক্সাইড নিঃসরিত হতে পারছে না। এ বরফই নতুন করে পৃথিবীতে বরফ যুগের সূচনা করতে পারে।

গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং আর আজকের আধুনিক মানুষের পূর্ব প্রজন্মগুলো (যেমন: অস্ট্রালোপিথেকাস প্রজাতির নানা প্রাণী)।

জীবাশ্ম থেকে যদি বিবতর্নের বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি এবং মানুষের আগের প্রজাতি মুখায়ব আঁকা হয় তাহলে তাদের পূর্বপুরুদের চেহারা কেমন হয়? বড় হয়ে এসব বিষয়ে তোমরা আরও অনেক কিছু পড়বে। তবে মজার বিষয় হল, এপ্দের থেকে মানুষের বিবর্তন ধীরে ধীরে হয়েছে। আধুনিক মানুষে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে শরীরের অনেক কিছু বদল ঘটেছে। প্রধান বদল ঘটেছে হাঁটার ধরনে, হাত দিয়ে কোনো জিনিস ধরার ভঙ্গিতে, মাথার আকারে, মুখমন্ডলের বদলে। এই বদল তোমরা এই অধ্যায়ের ছবিগুলো বা ইন্টারনেট থেকে মানুষের পরিবর্তনের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। মানুষ হয়ে ওঠার সবচাইতে বড় বদল হলো 'দুই পায়ে সোজা হয়ে হাঁটতে পারা।' প্রাইমেটরা দুই পায়ে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটে। কখনও কখনও চার পায়েও হাটে। কোনো জিনিস ধরে ঠিকঠাক ব্যবহার করা (যেমন: কাটাকুটি করা, আঘাত করে কোনো কিছু ছেঁচা, শক্ত করে ধরে ছুড়ে মারা ইত্যাদি) যত ভালোভাবে পেরেছে, ততই মানুষ হয়ে উঠেছে। হাতের মুঠো করা আর হাতকে নানা কাজে ব্যবহার করতে পারাও মানুষের একটা বড় লক্ষণ। মাথার আকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুই পায়ে সোজা হয়ে হাঁটা বা দৌড়ানো, কোনো কিছুকে দৌড়ে ধরে ফেলা এবং বুদ্ধির ব্যবহার করতে পারার সম্পর্ক ছিল।

হাত ও হাতের মুঠোর ব্যবহার যতো ভালো হয়েছে, ততোই মানুষ তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে ভালোভাবে। চারপাশের গাছের ফলমূল সংগ্রহ করা, প্রাণী শিকার করা, পাথর, গাছের ডাল ও অন্য প্রাণীর হাড় দিয়ে নানান ধরনের হাতিয়ার তৈরি করতে পেরেছে। আধুনিক মানব প্রজাতি বা হোমো সেপিয়েন্সদের সঙ্গে আগের প্রজাতিগুলোর আরেকটা ফারাক খুলির বা করোটির আকার, গঠন আর মগজের পরিমাপে। হাতের মুঠো ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করায় আধুনিক মানব প্রজাতি চারপাশের বিভিন্ন বস্তুকে ব্যবহার বা পরিবর্তন করার সামর্থ্য অর্জন করে। চারপাশের পাথর, গাছের ডাল ও বাকল, প্রাণীদের হাড় ও চামড়া সংগ্রহ করা, পরিবর্তন করা এবং নানা কাজে ব্যবহার করতে শেখে ধীরে ধীরে। পাথর বা কাঠ বা হাড় দিয়ে নানা কাজের জন্য হাতিয়ার বানানো শিখতে পারাটা এই প্রজাতির মানুষের বিকাশের প্রথম পর্যায়ের বড় অর্জন।

অনেকগুলো মানুষের আর হোমিনিডের প্রজাতি কিন্তু একসঙ্গেও বসবাস করেছে। একটা জিনিস জানা খুব জরুরি। মানুষের আগের প্রজন্মগুলোর বেশির ভাগের উৎপত্তি হয়েছে বর্তমান আফ্রিকা মহাদেশে। হোমো প্রজাতির সবচেয়ে পুরোনো প্রজাতিরও বিকাশ ঘটেছিল আফ্রিকায় আনুমানিক ২৪ লক্ষ বছর আগে। তারা হোমো হ্যাবিলিস নামে পরিচিত। পরে প্রায় ১৯ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেকটাস নামের আরেকটি প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। একই সময়ে হোমো রুডোলফেসিস নামের আরেকটি প্রজাতির উদ্ভবও ঘটে আফ্রিকায়। আরও অনেক পরে প্রায় চার লক্ষ বছর আগে হোমো নিয়ানডারথালেনথিস প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। আর আমরা, মানে, হোমো সেপিয়েন্সদের উদ্ভব ঘটে প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে। বর্তমান রাশিয়ার সাইবেরিয়ার একটি গুহায় কয়েক টুকরা ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে জানতে পারেন, সেটি একটি ১৩ বছর বয়সের মেয়ের ফসিল। বাচ্চাটি সেপিয়েন্সও না, নিয়ানডারথালও না। বাচ্চাটি নতুন একটি প্রজাতির। এই প্রজাতির নাম দেওয়া হয়েছে ডেনিসোভিয়ান। মেয়েটির নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন ড্যানি।

এসব হোমো প্রজাতির মধ্যে কেবল হোমো সেপিয়েন্স বা আমরাই টিকে গেছি। বাকিরা নানা কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন জলবায়ু পবিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না-পারা, অন্য প্রজাতিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে ওঠাসহ নানা কারণে নিয়েনডারথাল ও ডেনিসোভিয়ানরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন

প্রজাতিই আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে বংশবিস্তার করে। ইউরোপ, এশিয়ার বিভিন্ন অংশ হয়ে ভারত উপমহাদেশ পার হয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। একটি অংশ চীন হয়েও আরও পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আরেকটি দল দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

বিভিন্ন জায়গার ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণীসহ জলবায়ু বিভিন্ন রকম হওয়ায় বিভিন্ন প্রজাতিকেই একেকটি নতুন নতুন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। নতুন নতুন হাতিয়ার ও হাতিয়ার তৈরির কৌশল খুঁজে বের করতে হয়েছে। নতুন নতুন খাদ্যাভ্যাস আর আচার-আচরণ রপ্ত করতে হয়েছে। মোটামুটিভাবে পাথরের হাতিয়ার তৈরির কৌশল শেখার সময় থেকেই আমরা প্রাগিতিহাসের শুরু বলে মনে করি। প্রায় ৩৩ লক্ষ বছর আগে প্রাইমেট গোত্রীয়রা সর্বপ্রথম পাথরের হাতিয়ার তৈরি করে ছোট ছোট কাজ করা শেখে।

হোমো প্রজাতিগুলো পাথরের হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার করতে পারত। একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকত। গুহায় বসবাস করত। শিকার করতে বা ফলমূল সংগ্রহ করতে পারত। একেকটি দল যখন একত্রে একটা স্থান থেকে দুরের আরেকটা স্থানে যেত, তখন তাদের মধ্যে একধরনের আত্মীয়তা ও গোত্রের ধারণা তৈরি হয়। আমরা এখন

প্রস্তর যুগের অন্যতম প্রধান পাথরের হাতিয়ার হ্যান্ড-অ্যাক্স (আমাদের এখনকার হাত-কুঠারের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে) তৈরি করত। দুই হাত দিয়ে পাথরের টুকরার উপরে পাথরের টুকরো দিয়ে আঘাত করে ভেঙে, কাঠের ছোট টুকরো বা লাঠি দিয়ে আঘাত করে ছোট ছোট পাথরের ছিলকা ভেঙে এই হাতিয়ার তৈরি করা হতো।

মানুষ বসে এভাবেই পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করত প্রস্তর যুগে।

ক

খ

গ

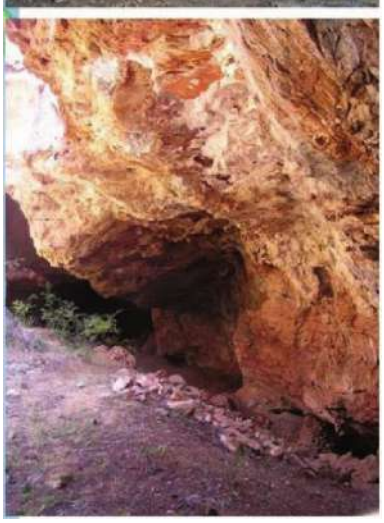

ক) আফ্রিকা মহাদেশ ছিল মানব বিবর্তনের প্রধান কেন্দ্র। পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ ও মানুষের আদি-প্রজাতিগুলোর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পূর্ব আফ্রিকায়

খ) পাথরের বিভিন্ন স্তর থেকে জীবাশ্মগুলো পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চুনাপাথরের গুহা থেকে ফসিলগুলো পাওয়া গেছে

গ)। আফ্রিকা থেকে পরে বিভিন্ন সময়ে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে (এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে মানুষের এই যাতায়াতের অভিবাসন বলা হয়)।

প্রাগিতিহাসের সময়ে মানুষের জ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানুষের সমাজ ও আচার-আচরণ এবং মানুষের জীবনযাপনের ধরনের বদল নিয়ে সংক্ষেপে আলাপ করব।

আমরা তো দেখলাম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি কীভাবে আদি অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বর্তমান মানুষে পরিবর্তিত হয়েছে। তোমরা কি জানো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানও একই ভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার রূপ বদলে চলেছে। এদের সৃষ্টি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে থাকলে পৃথিবীর রূপ হয়ে ওঠে আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট অর্থাৎ বলা যেতে পারে আমরা আরও ভালোভাবে চিনতে শুরু করি পৃথিবীর-ভূমিরূপসমূহ। তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে সেসব প্রক্রিয়া! আমরাও সেগুলো ধাপে ধাপে জানার চেষ্টা করব।

পৃথিবী যখন প্রথম সৃষ্টি হলো, তখন এটি প্রচন্ড উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল, তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়েও বেশি। কোনো বাতাস ছিল না, ছিল শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং জলীয় বাষ্প। পৃথিবী ছিল বিষাক্ত। এই নতুন গ্রহটি ছিল গলিত পাথর এবং লাভার সমুদ্র।

তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর পরিবর্তন হতে হতে বর্তমান অবস্থার রূপ নিয়েছে। ঠিক যেন আমাদের মতো তা-ই না! চলো এবার দেখে নিই এখন থেকে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন বছর আগে থেকে ২০ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে কেমন সব পরিবর্তন এলো–প্রথমে তো পৃথিবীজুড়ে সমুদ্রই ছিল এবার তাহলে জানা যাক ভূমি কীভাবে এলো–পৃথিবীর জন্মের প্রায় ১.২ বিলিয়ন বছর পর পৃথিবীর অনেক ভেতরে যে গলিত ও অর্ধ-গলিত বস্তু আছে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে পানির নিচের ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে এবং আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। আগ্নেয়গিরির লাভা পুরো সমুদ্রে ছড়িয়ে গিয়ে আগ্নেয় দ্বীপ সৃষ্টি হয়। এই আগ্নেয় দ্বীপ পরে সংযুক্ত হয়ে পৃথিবীর প্রথম মহাদেশ গঠিত হয়।প্রথম মহাদেশ তৈরি হবার পর এক বিলিয়ন বছর তেমন কিছুই হয়নি পৃথিবীতে। একেবারে একঘেয়ে একটা সময় গেছে। মহাদেশগুলো আটকে ছিল একটা ট্রাফিক জ্যামে অর্থাৎ তেমন একটা নড়াচড়া করেনি। প্রাণের তেমন কোনো উন্নতিও ঘটেনি এ সময়ে। একে ভূবিজ্ঞানীরা বলেন মহা-মহাদেশ।

মহা-মহাদেশের মাঝে একটি হলো প্যানগায়া। পরবর্তী সময়ে প্যানগায়ার মাধ্যমে অখন্ড মহাদেশটি বিভক্ত হয়ে তৈরি করে অনেকগুলো মহাদেশ।

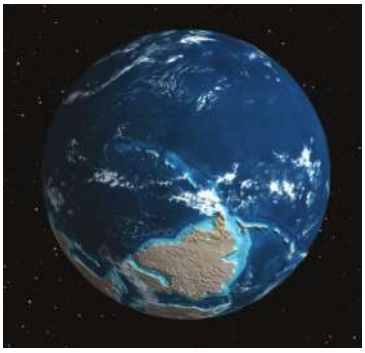

৬০০ মিলিয়ন বছর আগে

৪০০ মিলিয়ন বছর আগে

২০০ মিলিয়ন বছর আগে

এবার তোমরা এতক্ষণ যা পড়েছ, সেই ঘটনাগুলো একটি পৃষ্ঠায় এনে দেখার চেষ্টা করা যাক।

ক. প্রথমে তোমরা মানুষের গল্পের শুরুর ৩.৩ মিলিয়ন (৩৩ লক্ষ) বছর থেকে শুরু করে এখন থেকে ৩ লক্ষ বছর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিবর্তনের কথা তোমরা যা জেনেছ, তার একটি তালিকা করবে।

খ. এবার তোমরা উপরের নমুনা অনুসারে একটি স্কেল বা রুলার আঁকবে। মনে রাখবে, তোমরা স্কেলে ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারে দাগ থাকবে না। দাগ হবে মিলিয়ন বছরের হিসাবে।

গ. একেকটা দাগ ০.৫ মিলিয়ন (৫ লক্ষ) বছরের হিসেবে।

ঘ. তোমরা চারটি কালের (৩.৩, ২.৪, ১.৯ এবং ০.৩ মিলিয়ন বছর আগের) চিহ্নিত করবে। নমুনার মতো করে অথবা তোমার যেভাবে ভালো লাগে স্কেলের মাধ্যমে ঘটনার মূল বিষয় উপস্থাপন করবে।

ঙ. তোমার আঁকা বা সংগ্রহ করা ছবিও ছোট ছোট করে কেটে সাজাতে পারো।

১ম ছবি পূর্বে

প্যানগিয়া- ইউরেশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অ্যান্টার্কটিকা, অস্ট্রেলিয়া, টেথিস মহাসাগর

২য় ছবি পরে

উত্তর মহাসাগর, উত্তর আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ আমেরিকা, আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর, ইউরেশিয়া, আফ্রিকা, ভারত মহাসাগর, অ্যান্টার্কটিকা

এরপর একটি মহাদেশ অন্যটির সঙ্গে ধাক্কা লাগছিল, এর ফলে যেমন তারা পরস্পরের থেকে দূরে যাচ্ছিল, তেমনই সৃষ্টি হচ্ছিল নানা ভূমিরূপ। কখনও মহাসাগর তো কখনও সুবিশাল পর্বতমালা। একদিকে এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট, তেমনি অপরদিকে গভীরতম খাত-মারিয়ানা। একদিকে আমেরিকার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গিরিখাত তো আর একদিকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বৃহৎ ব-দ্বীপ সমভূমি।

১০০ মিলিয়ন বছর আগে

৫০ মিলিয়ন বছর আগে

২০ মিলিয়ন বছর আগে

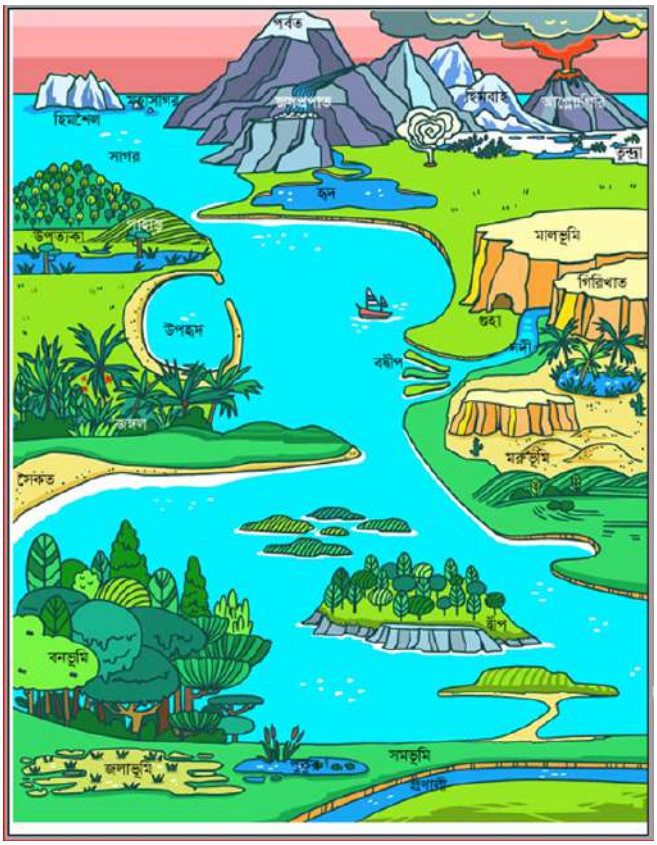

মানুষের প্রাগিতিহাস আর মানুষ হয়ে ওঠার আশ্চর্য কাহিনি

কীভাবে ইতিহাস জানা যায় আর সেই ইতিহাসে কীভাবে সময়কে বিভিন্ন যুগে শ্রেণিবিভক্ত করা হয় তা আমরা প্রথম অধ্যায়ে জেনেছি। মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যেমন দৈহিক বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে, ঠিক তেমই মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এই পরিবর্তন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একই সময়ে ঘটেনি।

মানুষ যেমন আফ্রিকা মহাদেশে আবির্ভূত হয়ে পরে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, বসবাস করেছে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েছে। মানুষের এই ছড়িয়ে পড়াকে বলে মানুষের অভিবাসন। প্রাগিতিহাসের সময়ে এই অভিবাসন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। মানুষ হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে। প্রাগিতিহাসকে আগে তিনটি যুগে ভাগ করা হতো: পাথরের যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ এবং লৌহ যুগ। মানুষ কোন ধরনের উপাদান হাতিয়ার নির্মাণের জন্য ব্যবহার করছে তার ওপরে ভিত্তি করে এই যুগবিভাজন হয়েছিল। পরে বিজ্ঞানীরা নতুন করে যুগবিভাজন বা সময়কে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করেন। প্রস্তর যুগকে ভাগ করা হয় প্রধানত তিনটি যুগে– প্রত্নপ্রস্তর বা পুরোপলীয় যুগ, মধ্যপ্রস্তর যুগ এবং নিম্নপ্রস্তর বা নবোপলীয় যুগ। প্রত্নপ্রস্তর বা পুরোপলীয় যুগকে আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়: উচ্চপ্রত্নপ্রস্তর যুগ, মধ্যপ্রত্নপ্রস্তর যুগ আর নিম্নপ্রত্নপ্রস্তর যুগ। পরের যুগটিকে বলা হয় তাম্রপ্রস্তরযুগ। এই যুগে তামা ও পাথর মানুষ একই সঙ্গে ব্যবহার করত। বিভিন্ন যুগেই পাথরের পাশাপাশি মানুষ কাঠ বা গাছ, হাড়সহ নানা উপকরণ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছে। পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করার ক্ষেত্রে মানুষ ধীরে ধীরে ধীরে নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার

করেছে। এর পাশাপাশি মানুষের জীবন, খাদ্য সংগ্রহের ধরন, সমাজের ধরন পাল্টেছে। নিচের ছবিগুলোতে এই যুগবিভাজন সম্পর্কে ধারণা পাবে।

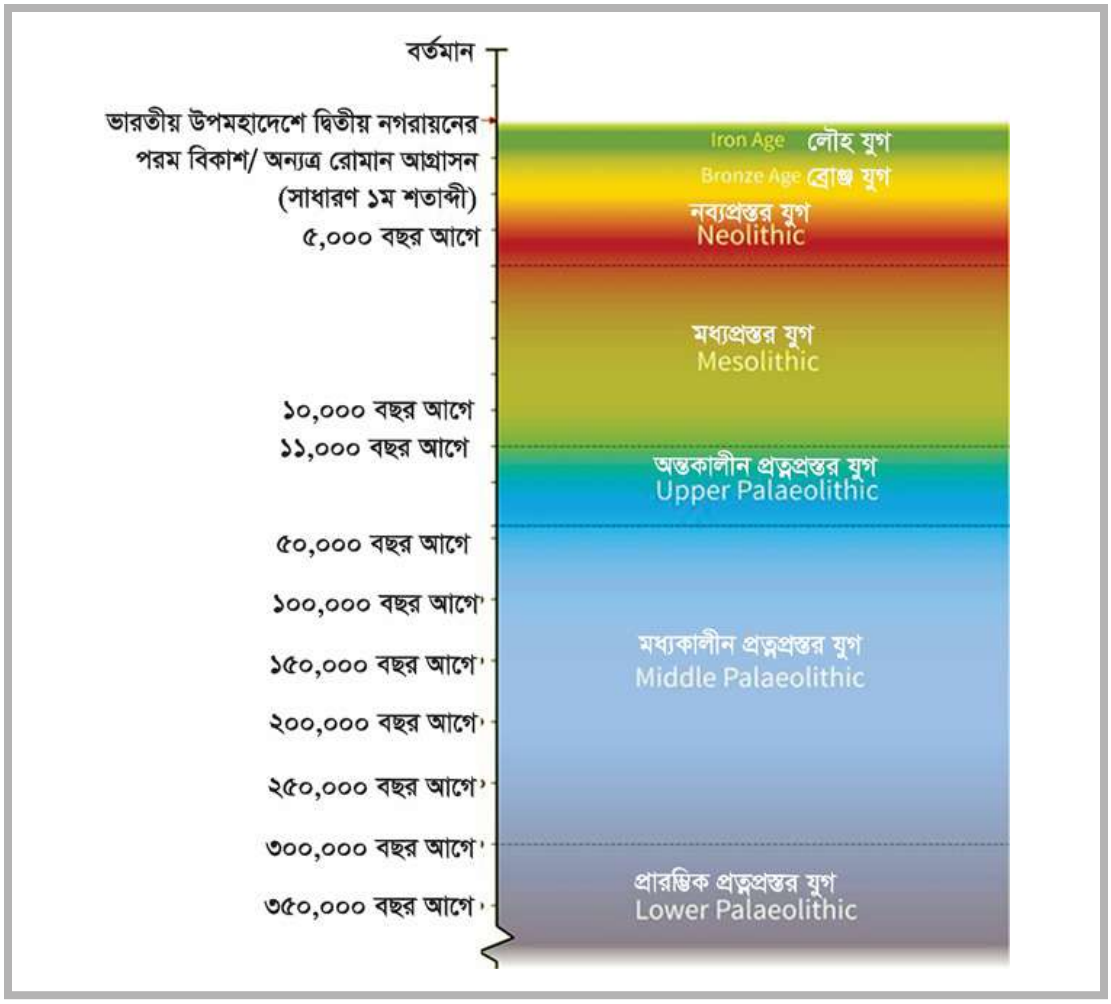

প্রাগিতিহাসের বিভিন্ন পর্ব ও সময়কাল

প্রস্তর যুগ থেকে লৌহযুগের বিভিন্ন পর্বের সময়কাল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একই ভাবে এই প্রস্তর যুগ থেকে লৌহ যুগের আবির্ভাব ঘটেনি। তাই কোনো স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রেখা দিয়ে এই কালানুক্রম বা সময়ের ক্রমকে আলাদা করা যায় না।মানুষের আফ্রিকায় উদ্ভব হওয়ার পরে প্রথম পর্যায়ে তারা আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত প্রাকৃতিক ও জলবায়ুগত কারণে। পরে জলবায়ুর বিভিন্ন বদল, বিশেষ করে বরফ যুগের আবির্ভাব এবং শিকার-সংগ্রহের উৎসের অপ্রতুলতাসহ নানা কারণে তারা আফ্রিকার বাইরে ইউরোপ ও এশিয়া হয়ে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়েছিল হোমো নামের প্রজাতিগুলোর বিকাশের আগেই। পরে বিভিন্ন সময়ে দলে দলে মানুষ আফ্রিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠার মানচিত্রে এই অভিবাসনের একটি ধারণা তোমরা পাবে:

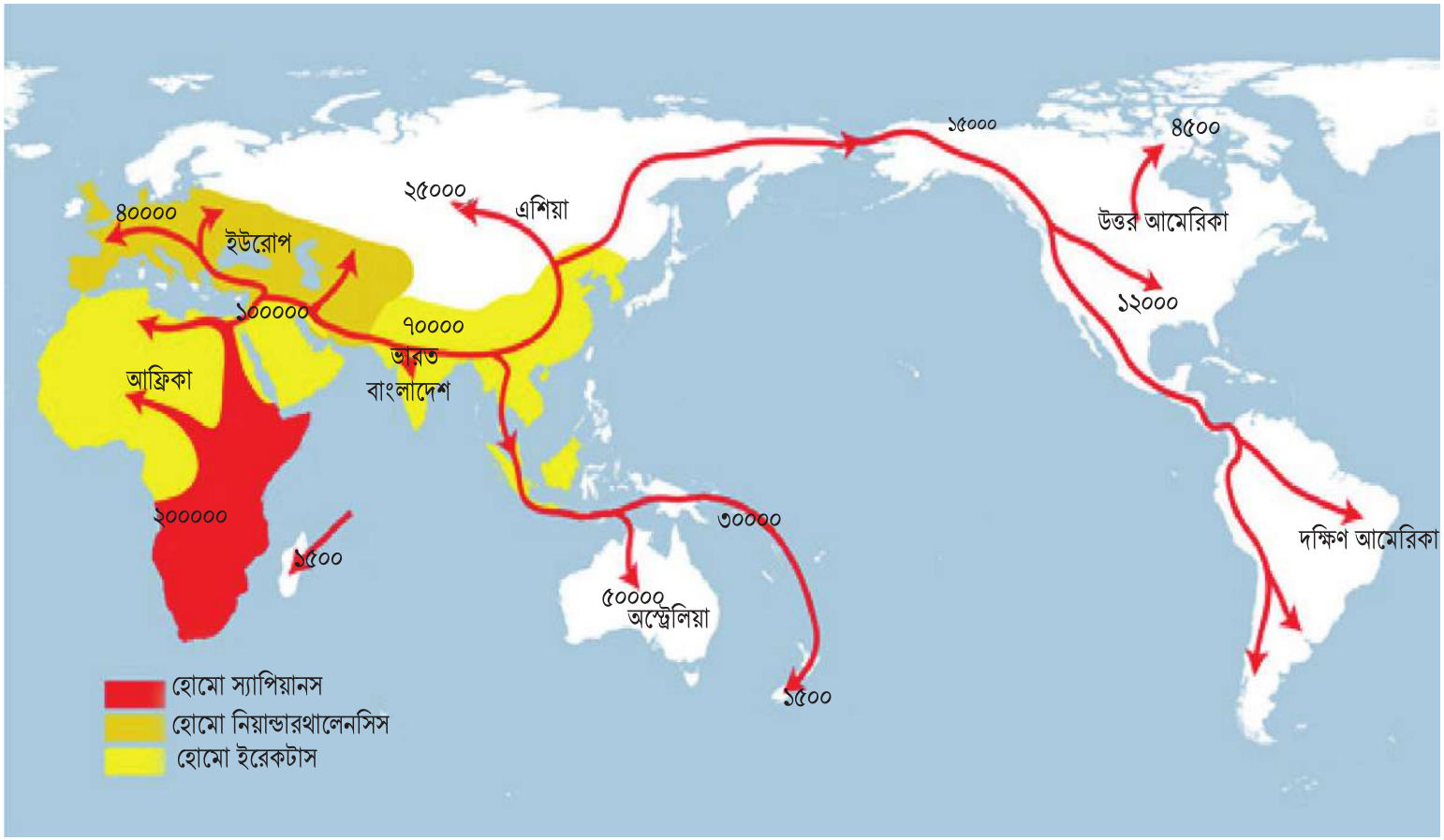

বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আফ্রিকার বাইরের অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়া বা অভিবাসনের ব্যাপ্তি।

অভিবাসন যুগে যুগে

কাজের নির্দেশনা: একেক দলে পাঁচজন করে শিক্ষার্থী কয়েকটি দলে নিচের কাজটি করবে। প্রথমে দলের সকলে নিজে নিজে নিচের কাজটি করবে। তারপর সকলে নিজ নিজ দলে বসে আলোচনা করে সবার লেখা মিলিয়ে একটি লেখা উপস্থাপন করবে। তারপর একটি দল অন্য সকল দলের কাজের উপর নিজেদের মূল্যায়নমূলক মতামত বলবে।

কাজের বর্ণনা: মনে করো, তোমার পরিবার-পরিজনদের কিংবা তোমার পরিচিতদের মধ্যে কেউ একজন বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনো দূর দেশে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। তিনি হয়তো চাকুরির উদ্দেশ্য বা আরও উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য গিয়েছিলেন। তিনি এখন আর বাংলাদেশের নাগরিক নন। কিন্তু তাঁর হয়তো বাংলাদেশ যাওয়া-আসা আছে। যে দেশে তিনি বাস করেন, সেখানে অন্যান্য বাংলাদেশি বা অন্যান্য এশিয়ান নিয়ে একটা সামাজিক পরিবেশে তিনি বাস করেন। তারা হলেন এ-কালের অভিবাসী। তোমাদের বইতে প্রাচীনকালে অভিবাসনের মাধ্যমে মানব প্রজাতির আফ্রিকা মহাদেশ থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার কাহিনি বলা হয়েছে। সেই অভিবাসনের সঙ্গে এই অভিবাসনের তুলনা করে পাঁচটি মিল ও পাঁচটি অমিল খুঁজে বের করো।

প্রত্নপ্রস্তর যুগে মানুষের হাতিয়ার ও জীবনযাপন

মানুষ প্রত্নপ্রস্তরযুগে পাথর ভেঙে , ঘষে, ছোট ছোট টুকরা করে ব্যবহার করেছে নানা কাজে। নিম্নপ্রত্নপ্রস্তর যুগ ও উচ্চপ্রত্নপ্রত্নপ্রস্তর যুগের ব্যাপ্তি অনেক বেশি ছিল। প্রথম মানুষ যখন পাথর পরিকল্পিতভাবে ভাঙার কৌশল শিখলোআর সেই কৌশল প্রয়োগ করে পাথরকে ভেঙে ভেঙে নানান আকৃতি দেওয়া শুরু করল তখনই প্রস্তর যুগের সূচনা। তবে এই যুগগুলোতে কিন্তু তখনো হোমো-প্রজাতির মানুষের উদ্ভব ঘটেনি। মানুষকে নিরন্তর প্রতিকূল প্রকৃতি, বন্য হিংস্র জীবজন্তুসহ নানাধরনের পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। যেখানে তখন যাযাবরের মতন এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। আফ্রিকার বাইরে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে এসময়েও মানুষ ছড়িয়ে পড়ে। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মানুষ শিকার করত। ফলমূল সংগ্রহ করত। এই সময়ের মানুষের সেরা আবিষ্কার হলো পাথর ভেঙে ভেঙে একটি হাতিয়ার তৈরি করা যাকে বিজ্ঞানীরা হ্যান্ড-অ্যাক্স বা হাত-কুঠার নামে ডাকেন। আমাদের পরিচিত এখনকার কুঠারের সঙ্গে এই কুঠারের কোনো মিলই কিন্তু নেই। এই হাতিয়ার কিন্তু মানুষরে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী শিকার করার, ফলমূল ছেঁচার, কোনো কিছুকে কাটায় সমর্থ করে তুলেছিল। নিম্নপ্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে অথবা মধ্যপ্রত্নপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকে মানুষ দ্বিতীয় বড় আবিষ্কার করে। নিজে নিজে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে আগুন জ্বালাতে ও আগুন ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। আগুনের আবিষ্কার মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে। খাবারদাবার রান্না করা কিংবা কোনো কিছু পোড়ানো বা গরম করা, আগুন জ্বালিয়ে শীত থেকে রক্ষা পাওয়াসহ নানা রকমের সুবিধা পাওয়া শুরু হয়।

মানুষের ইতিহাসের প্রথম বড় আবিষ্কার: পাথর ভেঙে তৈরি করা অ্যাসিউলিয়ান হ্যান্ড-অ্যাক্স

প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের বৈচিত্র্য আর ব্যবহারের বিভিন্নতা

আলতামিরার গুহায় উচ্চপ্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষদের আঁকা বাইসনের বিখ্যাত চিত্র

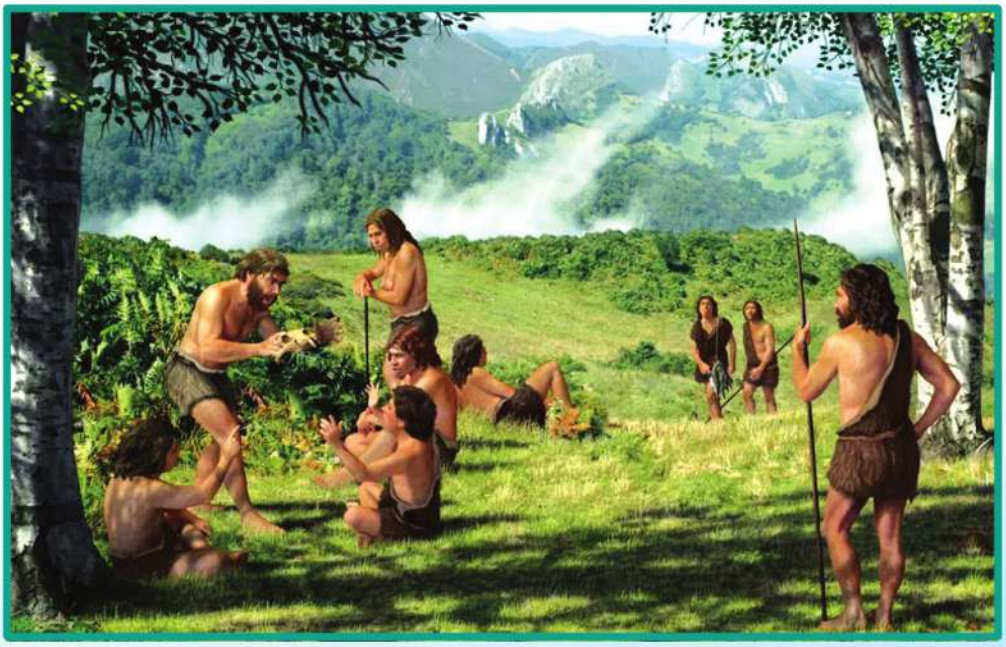

মানুষের দৈনন্দিন দলবদ্ধ জীবনের কাল্পনিক ছবি।

প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের বসতি ও কাজের কাল্পনিক চিত্র

বরফ যুগের প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের হাতি (নাম ছিল ম্যামথ) শিকারের কাল্পনিক চিত্র।

উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর যুগে পাথরের হাতিয়ার ছোট হতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই সময়ে মানুষ শিকার ও সংগ্রহের জন্য অনেক বেশি উপযুক্ত হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়। দৈনন্দিন নানান কাজে পাথর, হাড়, বা কাঠের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করা শুরু করে। তার মানে হলো, আগের তুলনায় মানুষের শিকার করার ও খাদ্য গ্রহণ করার বৈচিত্র্য তৈরি হয়। মানুষ দলবদ্ধভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলাচল করত। এ সময়ে এই গোষ্ঠীগুলোর চলাফেরার বিস্তৃতি বাড়ে। সাময়িকভাবে খোলা স্থানে ছাউনি বা আবাসন তৈরি করাও শুরু করে। এই গোষ্ঠীগুলোই নিজেদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে গোত্র সৃষ্টি করে পরবর্তী সময়ে। সেখান থেকেই পরিবারের ধারণা তৈরি হয়। এই যুগের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো মানুষের শিল্পদক্ষতার পূর্ণ-প্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন স্থানের গুহার মধ্যে মানুষ হাতে আঁকা অসাধারণ সব দৃশ্য ও দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকে। এই গুহাচিত্রগুলোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়। মানুষ বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই যুগেই নিয়ানডার্থাল, ডেনোসোভিয়ান আর আধুনিক মানুষ, সেপিয়েন্স প্রজাতির মানুষের উদ্ভব ঘটে।

সময়ের ধারাবাহিতকায়ই প্রায় ১০-১২ হাজার বছর আগে একটা বরফ যুগের পরের তুলনামূলক উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়াজুড়ে বিরাজ করা শুরু করে। মানুষ তখন আরও বড় এলাকাজুড়ে ঘুরে বেড়ানো, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী শিকার করা, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ আর তৈরি করার সামর্থ্য অর্জন করে। পাথরের হাতিয়ারগুলো ছোট হয়ে যায়। সেই হাতিয়ারগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য বাড়ে অনেক। তীর-ধনুক, বর্শাসহ নানা প্রকারের হাতিয়ার ব্যবহৃত হওয়া শুরু করে। এই যুগকেই বলে মধ্যপ্রস্তর যুগ। ছোট ছোট পাথরের বা হাড়ের হাতিয়ার ব্যবহার করার কারণে এই সময়কে ছোট পাথরের যুগও বলা হয়। মানুষ এই সময়ে কবর দেওয়ার প্রথা শুরু করে। পরিবারের একধরনের প্রাথমিক গড়ন তৈরি হয়। মানুষ পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল ভূমিতে আর নদী বা হ্রদের

প্রস্তরযুগ ও ধাতুর যুগের মানুষের তৈরি করা, ব্যবহার করা বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন। এখানে পাথরের, কাঠের, ধাতুর, ঝিনুকের, মাটির বিভিন্ন ধরনের বস্তুর ছবি রয়েছে।

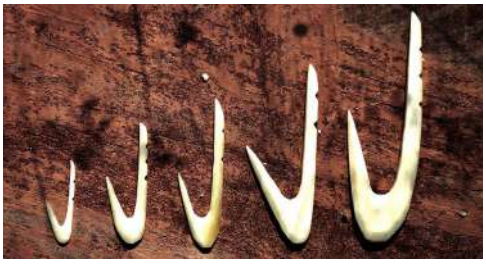

হাড়ের তৈরি বড়শি

নারী শিকারির হরিণ শিকারের কাল্পনিক দৃশ্য। আবিষ্কৃত প্রমাণের ভিত্তিতে আঁকা হয়েছে।

প্রস্তর যুগের একটি বসতিতে মানুষ কী কী কাজ করছে? তুমি দেখে একটা তালিকা করতে পারবে?

পাড়ে সাময়িকভাবে বসতি তৈরি করা শুরু করে। এই সময়ের শেষের দিকে ছোট ছোট আকারে জুম চাষের মতন কৃষিকাজ মানুষ আয়ত্ত করে। তার মানে হলো, এতকাল মানুষ প্রাকৃতিক ভাবে জন্মানো গাছ, শস্য ও ফলমূলের উপরেই নির্ভর করত। বন্য উদ্ভিদ ও শস্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত। এখন মানুষ ধীরে ধীরে বিভিন্ন শস্য বাছাই করে নিয়ন্ত্রিতভাবে চাষাবাদ শুরু করে। মানুষের হাতে বানানো বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্রও বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে মধ্যপ্রস্তরযুগের। এই যুগের পরে আসে মানুষের জীবনে ও ইতিহাসে প্রথম বিরাট বদল। এই বদল ঘটে যে যুগে সেই যুগকে নাম দেওয়া হয়েছে নব্যপ্রস্তর যুগ বা নতুন পাথরের যুগ।

প্রস্তর যুগের মানুষের মাছ শিকারের কাল্পনিক ছবি

বরফযুগে মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের বসতি ও প্রাণী শিকার করে মাংস রান্না।

মানুষের ইতিহাসে প্রথম বড় বদল: নব্যপ্রস্তর যুগ

নতুন পাথরের যুগ বা নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষ এমন কী কী করেছিল যা মানুষের জীবনে, সমাজে আর চিন্তায় এমন বিরাট সকল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। বিজ্ঞানীরা এই বদলের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। হাতিয়ারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ বিচিত্র ও নানাধরনের উপাদানের ব্যবহার করা শুরু করেছিল। বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি করেছিল।

এই যুগেই মানুষ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিতভাবে পছন্দমতন শস্য ও উদ্ভিদের চাষাবাদ করা শুরু করে। ফলে এতদিন যেভাবে মানুষকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো, তার অবসান ঘটে অনেক ক্ষেত্রে। স্থায়ীভাবে মানুষ বসবাস করা শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের পশু পালন করাও রপ্ত করে। গবাদি পশু থেকে শুরু করে শিকার করায় সহযোগিতা করার জন্য কুকুরের মতন প্রাণী বা ঘোড়াও পোষ মানায়। পরিণতিতে মানুষের গ্রাম বা প্রায় শহরের মতন বসতিও গড়ে ওঠে নানা স্থানে।

নব্যপ্রস্তর যুগে কাঠ ও বেত দিয়ে তৈরি করা ছোট লাঙল

নব্যপ্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি নানা ধরনের নিদর্শন ও হাতিয়ার

নব্যপ্রস্তর যুগের একটি বসতির কাছে জমি থেকে নারী ও পুরুষরা যৌথভাবে ফসল কাটছেন। পেছনে বসতির ঘর। এই ঘরগুলোর বৈশিষ্ট্য কী?

নব্যপ্রস্তর যুগের বসতির কাল্পনিক ছবি। কে কোন কাজ করছে সেটা ছবি দেখে বলতে পারবে? এই বসতিটি কোন ধরনের ভূমিরূপে অবস্থিত? ঘরগুলোর আকার কেমন?

তুরস্কের গোব্যাকলি টেপের সবচেয়ে পুরোনো স্থাপত্যের ধ্বংশাবশেষ, নব্যপ্রস্তর যুগের।

নব্যপ্রস্তর যুগের একটি প্রাচীরঘেরা বসতির ঘর, মানুষের কাজ, আর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কাজ করার কাল্পনিক চিত্র।

ভারত উপমহাদেশে নব্যপ্রস্তর যুগের সূচনা ধরা হয় আনুমানিক সাধারণ সপ্তম সহস্র পূর্বাব্দে। কৃষিকাজের কারণে নানান স্থানে ও গুহায় স্থায়ী গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠে। গম, যব, বার্লির চাষাবাদ শুরু হয়। বন্য প্রজাতির ধানের চাষাবাদেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে সাধারণ সপ্তম সহস্রপূর্বাব্দে। গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের গঠন হতে শুরু করে। বিভিন্ন গোত্র ও বংশধারা গড়ে ওঠে। এক বসতির লোকজনের সঙ্গে আরেক বসতির লোকজনের ব্যবসা ও বিনিময়ও শুরু হয়।

বর্তমানে পাকিস্তানের মেহেরগড় নামের একটি স্থানে নব্যপ্রস্তর যুগের যে বসতির প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই বসতিই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে একসময় সভ্যতার পত্তন ঘটায়। আমরা পরে সেই সভ্যতার কাহিনি পড়ব। মনে রাখতে হবে, নব্যপ্রস্তর যুগের এই পরিবর্তন হঠাৎ করে ঘটেনি। ধীরে ধীরে মানুষের কৃষিকাজ ও স্থায়ী আবাস তৈরি করা, বিভিন্ন প্রাণীকে পোষ মানানো, পশুপালন আর পশুচারণ শুরু হয়। ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র এই পরিবর্তন একই গতিতে, একই সময়ে ঘটেনি। কোথাও কোথাও সাধারন ১৫০০ পূর্বাব্দেও নব্যপ্রস্তর যুগীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তেমনই অন্তত পক্ষে দুটি স্থান পাওয়া গেছে বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার চাকলাপুঞ্জী ও কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতিতে। বিস্ময়কর হলো এখান থেকে পাথরের হাতিয়ার পাওয়া যায়নি। বরং বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গেছে জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া পাথরের মতন শক্ত কাঠের তৈরি। এই ফসিল উডের হাতিয়ার সম্ভবত নব্যপ্রস্তর যুগে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশ, বর্তমান ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আরও পূর্বে বর্তমান মিয়ানমারের বিভিন্ন স্থানের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তৈরি ও ব্যবহার করত।

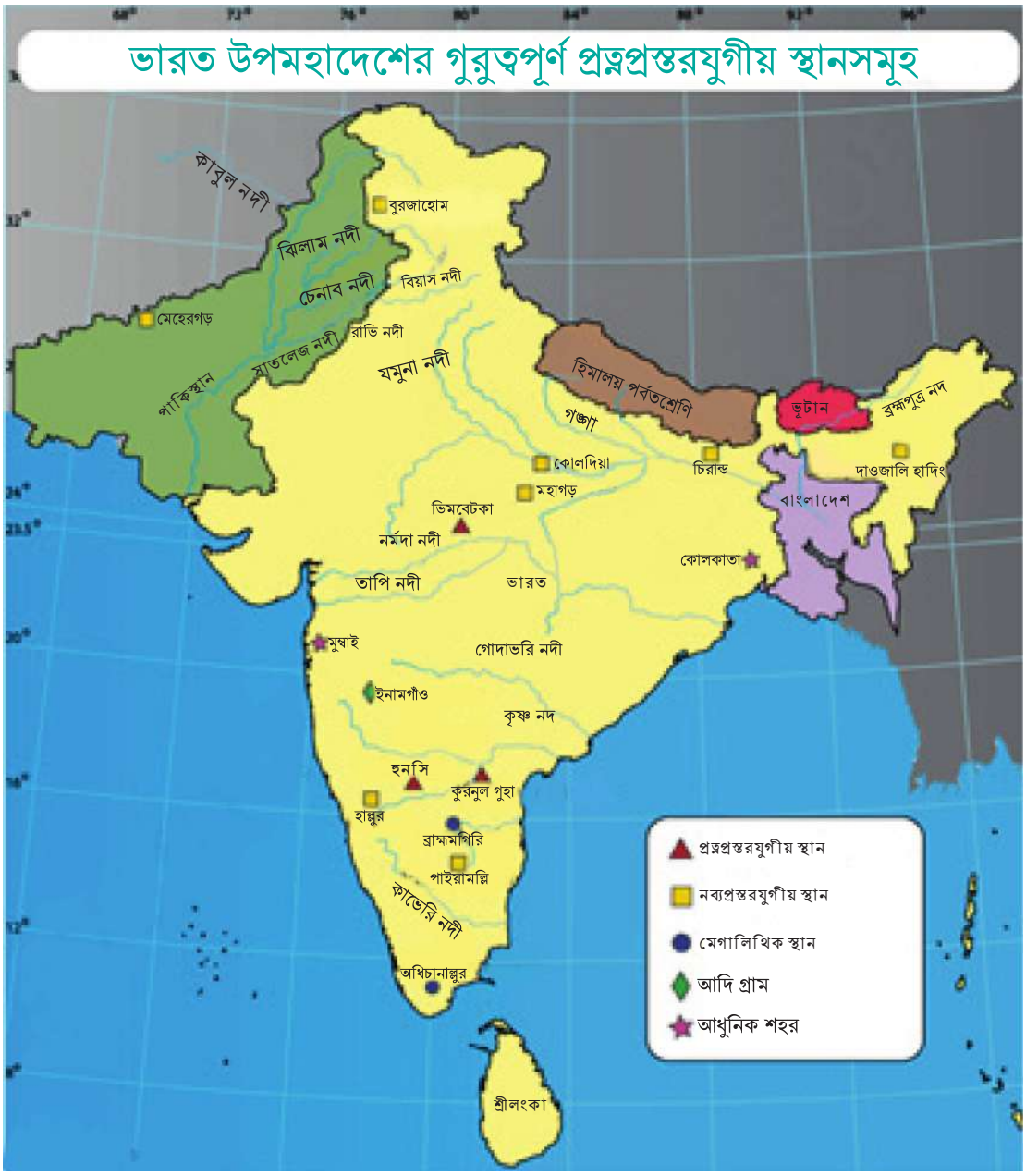

ভারত উপমহাদেশে প্রধান প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর ও মেগালিথিক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের অবস্থান

নবোপলীয় যুগের হাতিয়ারগুলো অনেক বেশি তীক্ষ্ণ এবং মসৃণ ছিল। ভাঙা ও মসৃণ পাথুরে হাতিয়ার, মাটি গর্ত করার ও ফসলে নিড়ানি দেওয়ার হাতিয়ার, কাস্তের মতন হাতিয়ার এবং লাঙলসহ নানা ধরনের নিত্যব্যবহার্য বস্তু ও জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। মানুষ মাটি ও বাঁশ-বেত-কাঠ দিয়েও নানা উপকরণ তৈরি করত। পরিধানের জন্য ও অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য কাপড়ও বুনতে শিখেছিল। কৃষিকাজ করতো বলে যে মানুষ শিকার করা ছেড়ে দিয়েছিল তা কিন্তু নয়। মানুষ মাংস-মাছ-ফলমূল-সবজি-ভাত-গম খেত বলেই অনুমান করা হয়।

নব্যপ্রস্তর যুগে চাকা আবিষ্কার করায় মানুষের পক্ষে যাতায়াত করা অনেক সহজ হলো। যোগযোগের উন্নতির কারণে অল্প সময়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারত গরুর গাড়ির মতন বাহনে চেপে। বিভিন্ন স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ওপরে ভিত্তি করে মনে করা হয় যে, বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মানুষ পালন করত। তুরস্কের ধর্মাচরণের স্থাপত্যের মতন স্থাপত্য দুনিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলে না-পাওয়া গেলেও নানা ধরনের পোড়া মাটির, হাড়ের, হরিণ জাতীয় প্রাণীর শিংয়ের, পাথরের দ্রব্যাদি ও ভাস্কর্য সেই সময়ের সমাজে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রচলনের প্রমাণ বহন করে।

নব্যপ্রস্তর যুগের কৃষিকাজ ভিত্তির বসতিতে বসবাস করার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজে ফসল উৎপাদন করা শুরু করে। পশুপালন করা শুরু করে। ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ওই সময়ের বসতির বাড়িঘর কেমন ছিল সে-সম্পর্কে ধারণা করার মতন প্রমাণও পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয়, সে-সময় গোলাকার বা বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার ঘরবাড়ি বানানো হতো বাঁশ-বেত-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে। ফসল রাখার জন্য গোলাঘরও বানানো হতো।

বাংলাদেশের চাকলাপুঞ্জীতে প্রাপ্ত জীবাশ্ম কাঠের তৈরি নব্যপ্রস্তরযুগীয় হাতিয়ার

ধাতুর আবিষ্কার ও পাথর-ধাতুর ব্যবহারের যুগ: তাম্রপ্রস্তর যুগ

নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ সভ্যতার প্রস্তুতিপর্বে তামা আবিষ্কৃত হয়। যদিও এ সময় মানুষ খনি থেকে তামার আকর সংগ্রহ করতে পারতো না। তবে প্রাপ্ত পাথরের গা থেকে তামার আকর নিয়ে তা উত্তপ্ত করে কাঁচা তামা বের করে আনতো। নবোপলীয় যুগের মানুষ তামার হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। পাথুরে অস্ত্রের পাশাপাশি তাম্র অস্ত্র ব্যবহৃত হতো বলে সময়টি তাম্রপ্রস্তর যুগ নামেও পরিচিত।

প্রস্তর যুগের সমাপ্তি এবং নগর সভ্যতার উন্মেষের মধ্যবর্তীকালে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ মানবজাতির অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল। পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চল প্রস্তরযুগের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটিয়ে নবতর উদ্ভাবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে। এ সময় মানুষ নিরেট প্রস্তর নয় তাদের জীবনকে গতিশীল করার জন্য ধাতুর ব্যবহার করায়ত্ত করে। নবোপলীয় যুগের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আরও বেশি ক্রিয়াশীল ধাতু তামার আবিষ্কার করে। তামা আবিষ্কারের পথ ধরেই মানুষ উদ্ভাবন করে ব্রোঞ্জ। তামা আর টিনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়। ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণাংশ থেকে বিভিন্ন তাম্রপ্রস্তর যুগীয় হাতিয়ার এবং বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

ভারত উপমহাদেশের তাম্রপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির অবস্থান

ভারত উপমহাদেশের উত্তরাংশে প্রাপ্ত তাম্রপ্রস্তর যুগের কয়েকটি হাতিয়ার ও নিদর্শন

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যেসব গ্রামীণ বসতি আবিষ্কার করেছেন, তা থেকে ধারণা করা হয় গ্রামগুলো সুবিন্যস্ত ঘর দিয়ে গঠিত হতো। ঘরের মাঝখানে আঙিনা থাকতো। গর্ত করে শস্যাগার বানানো হয়েছিল। তামার আবিষ্কার মানুষের ইতিহাসে আরেকটি বড় ঘটনা হওয়ায় সেই ঘটনা তৎকালীন ও পরবর্তী জীবন, উৎপাদন, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে বদল নিয়ে এসেছিল। ব্রোঞ্জযুগীয় সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষের তামার ব্যবহার করতে শেখাটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল।

তামা নিষ্কাশনের কল্পিত দৃশ্য

নব্যপ্রস্তর যুগীয় একটি বসতি বা গ্রাম। মানুষজন কী কী কাজ করছেন তা চিহ্নিত করতে পারো? তোমার গ্রামে কোন কোন ধরনের কাজ চারপাশের মানুষজন করেন? ।

তুরস্কের আনাতোলিয়া অঞ্চলের নব্যপ্রস্তর যুগীয় একটি পরিকল্পিত বসতি চাতালহাইউক।

মানুষ হয়ে ওঠাটা তাহলে কেবলই দৈহিক ছিল না। মানুষের শারীরবৃত্তীয় বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সংস্কৃতি, উৎপাদন, পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণগত পরিবর্তনও ধীরে ধীরে ঘটেছে। সাধারণ ৬৫০০০ পূর্বাব্দের আগে বা পরে আধুনিক মানুষের অভিবাসন ভারত উপমহাদেশে ঘটেছিল। তার আগেও এখানে আধুনিক সেপিয়েন্স প্রজাতির পূর্বসূরিরা বসবাস করতো। কিন্তু ধীরে ধীরে জলবায়ুগত, প্রযুক্তিগত, উৎপাদনগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সেপিয়েন্সরা টিকে থাকতে পেরেছে। অন্য প্রজাতির মানুষ বিলুপ্ত হয়েছে। নানা সময়ে মানুষ আফ্রিকা থেকে নানা পথে ভারত উপমহাদেশে এসেছে। ভারত উপমহাদেশ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন যুগে মানুষের আগমনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রজাতিগুলোর সঙ্গে আগত প্রজাতির সংমিশ্রণও ঘটেছে। এই সংমিশ্রণ পরবর্তী সময়ে আরও চলবে। বর্তমান ইরান ও আশপাশের এলাকা থেকে একদল মানুষ ৬০০০-৫০০০ সাধারণ পূর্বাব্দের সময় বর্তমান ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে আগমন করে। ইতোমধ্যে বসতি তৈরি করা তুলনামূলকভাবে বেশিসংখ্যক স্থানীয় সেপিয়েন্সের সঙ্গে আগত সেপিয়েন্সদের মিশ্রণের ফলে যে মানুষগুলো সৃষ্টি হলো, তারাই পরে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। গড়ে তুলেছিল শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থা। সেই আলাপ আমরা পরের অধ্যায়গুলোতে করবো।

প্রাচীন মানুষের জীবন নিয়ে নাটক

এতক্ষণ আমরা সভ্যতা বিকাশের পথে প্রাচীন মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে পড়েছি। এখন চলো সবাই দলে ভাগ হয়ে এই যুগগুলো থেকে একেকটি যুগ নিয়ে একেকটি দল কাজ করি। কোন দল কোন কাল নিয়ে কাজ করবে, তা আগে থেকেই চলো ঠিক করে নেই।

এরপর নিজ নিজ দলের মধ্যে ওই যুগ সম্পর্কে আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি যুগের মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক খুব ভালো করে চিহ্নিত করি। তারপর তাদের জীবন যাপনের ধরন অনুযায়ী প্রতিটি গ্রুপ একটি করে ছোট নাটক রচনা করি। এতে প্রাচীন মানুষেরা কীভাবে খাবার সংগ্রহ করত, শিকার করত, কেমন পোশাক পড়ত বা কোথায় থাকত ইত্যাদি যতো রকমের তথ্য জোগাড় করা সম্ভব তার সবকিছুই রাখার চেষ্টা করি।

তারপর সেই নাটক কোনো নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণি কক্ষে প্রদর্শন করি। নাটকে যে যুগকে তুলে ধরা হচ্ছে সেই সময়ের মানুষের মতো মুখোশ, পোশাক, হাতিয়ার ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন সেই সময়কে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

সভ্যতার বিকাশ : এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে নগরায়ণ ও রাষ্ট্র

কৃষিকাজের প্রচলনে ও স্থায়ীভাবে বসবাসের সূত্রপাত, ধাতু হিসেবে ব্রোঞ্জের ব্যবহার, সমুদ্র ও স্থলপথে বাণিজ্যের বিস্তার, লিখন শৈলীর আবিষ্কার এবং সমাজ ও পেশাগত ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণিভেদ, সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন একটি শাসক-পুরোহিত-কেরানি শ্রেণির উদ্ভব মিলিয়ে মানুষ বিভিন্ন স্থানে সুপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট, স্থাপত্য, প্রাসাদ, ধর্মীয় স্থাপত্য, সাধারণ মানুষের বসবাসের আলাদা এলাকাসহ নগর তৈরি করে। অনেক ক্ষেত্রেই এই নগরগুলো এক একটি রাষ্ট্র ছিল। নগরের বিকাশের মাধ্যমে সমাজ-ধর্ম-শাসন-অর্থনীতিতে যে বড় বদল এলো, তাকেই নগরায়ণ বলা হয়ে থাকে। এই নগরায়ণ ছিল মানুষের ইতিহাসে প্রথম সভ্যতা গড়ে তোলার একটি লক্ষণ।

সভ্যতার বিকাশকে সরলভাবে মানুষের উন্নতি হিসেবে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই সভ্যতার ভালো দিকের পাশাপাশি মন্দ দিকও ছিল। মানুষ প্রযুক্তিগত উন্নতি করছে, নতুন নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করছে, সাহিত্য সৃষ্টি করছে, জ্যোর্তিবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে। এগুলো ভালো দিক। মন্দ দিকগুলো হলো মানুষে মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভেদ বেড়েছে, হানাহানি বেড়েছে, বিরাট পরিসরে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ হচ্ছে, প্রতিযোগিতা বেড়েছে, শাসকশ্রেণি হিসেবে একটি শ্রেণি তৈরি হয়েছে। মানুষকে বন্দী করে দাস হিসেবে অত্যাচার করা হচ্ছে। দাসদের দিয়ে সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজগুলো করানো হচ্ছে।

চলো, আমরা সভ্যতার আরও কিছু ভালো ও মন্দ দিক খুঁজে বের করি :

আমরা এরপর সভ্যতা সম্পর্কে যতই জানব, পাশাপাশি এর ভালো ও মন্দ দিক নিয়ে চিন্তা করব আর এই

	সভ্যতার ভালো দিক	সভ্যতার মন্দ দিক
১		
২		
৩		
৪		

তালিকায় যোগ করব।

বেশির ভাগে প্রথম দিককার সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল নদীবিধৌত উর্বর সমতলভূমিতে। এই নদী অববাহিকাগুলো কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত ছিল। নদীপথে যোগাযোগ ও য়বাণিজ্যের সুবিধা দিয়েছিল। প্রতিটি সভ্যতার এই বিশেষ ভূগোল-নির্ভরতা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা এই অধ্যায়ে সবগুলো সভ্যতা নিয়ে আলাপ করতে পারবো না। আফ্রিকা মহাদেশে বিকশিত মিসরীয় সভ্যতা, এশিয়া মহাদেশে বিকশিত মেসোপটেমীয় সভ্যতা আর ইউরোপে তুলনামূলকভাবে অনেক পরে বিকশিত গ্রিক ও রোমান সভ্যতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়েই তোমরা জানতে পারবে। বড় হয়ে এসব সভ্যতা, সেই সময়ের সমাজ, রাজনীতি, মানুষের জীবনযাপন নিয়ে অনেক বেশি জানতে পারবে।

সমভূমি

তোমরা তো বিভিন্ন ধরনের ভূমিরুপ সম্পর্কে জানতে পেরেছ যা পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রাকৃতিক গঠন। সেখানে আছে পাহাড়ের মতো কিছু আকর্ষণীয় ভূমিরূপ । আবার কিছু ভূমিরূপ আছে যা সমান বলে মনে হয় মানে খুব বেশি উঁচু নয় (৩০০ মিটারের বেশি নয়)। আসলে সেই সব ভূমিরূপকে সমতল ভুমি বা সমভূমি বলা হয়। সমতল ভূমি সাধারণত বিশাল এলাকা যা বেশির ভাগ সমতল।

চলো জেনে নেওয়া যাক কীভাবে সমতল ভূমি গঠিত হয়।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীতে প্রথম সমভূমি আগ্নেয়গিরির লাভা দ্বারা তৈরি হয়েছিল। লাভা পৃথিবীর উপরিভাগে ধাক্কা খেয়ে কিছু এলাকাকে সমতল করে তুলেছিল।

কিছু সমভূমি ক্ষয় দ্বারা গঠিত হয়েছে। যখন বাতাস, বরফ বা পানি ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় ভূমির কিছু অংশ ধুয়ে যায়। আবার ভাঙন প্রক্রিয়া পাহাড়ি জমিকে সমতল ভূমিতে পরিণত করতে পারে।

সমভূমি প্রতিটি মহাদেশে পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি ভূমি হচ্ছে সমভূমি।

তোমরা তো আলাদাভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক কাঠামো বা ভৌগোলিক অবস্থান, যেমন- নদী, মরুভূমি, বদ্বীপ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছ। এগুলোর চমৎকার অভিধানও তৈরি করেছ। এবারে এই যে বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস আমরা জানব, সেখান থেকে প্রতিটি সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করবো। সেগুলো সভ্যতার বিকাশে বা বিলুপ্ত হওয়া বা অন্য কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তা আমরা খুঁজে বের করবো :

সভ্যতার নাম : _____

যে প্রাকৃতিক কাঠামো বা কাঠামোগুলো প্রভাব ফেলেছে তার নাম: _____

_____

কীভাবে প্রভাব ফেলেছে : _____

প্রাকৃতিক কাঠামো কীভাবে প্রভাব ফেলেছে, কল্পনা করে তার ছবি আঁকি :

সভ্যতার নাম: _____

যে প্রাকৃতিক কাঠামো বা কাঠামোগুলো প্রভাব ফেলেছে তার নাম: _____

_____

কীভাবে প্রভাব ফেলেছে: _____

প্রাকৃতিক কাঠামো কীভাবে প্রভাব ফেলেছে কল্পনা করে তার ছবি আঁকি :

সভ্যতার নাম: _____

যে প্রাকৃতিক কাঠামো বা কাঠামোগুলো প্রভাব ফেলেছে তার নাম : _____

_____

কীভাবে প্রভাব ফেলেছে : _____

প্রাকৃতিক কাঠামো কীভাবে প্রভাব ফেলেছে কল্পনা করে তার ছবি আঁকি :

একই সভ্যতার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক কাঠামোর প্রভাব থাকতে পারে। প্রয়োজন বোধে খাতায় বাকি কাজগুলো করতে পারো।

মিসরীয় সভ্যতা: নীল নদের দান

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম একটি প্রাচীন সভ্যতার নাম মিসরীয় সভ্যতা। সভ্যতাটি নানা দিক থেকেই বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাসে তার স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উর্বর ভূমির কারণে মিসরে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রত্নস্থানও পাওয়া যায়। যেমন–মেরিমদে, বাদারি, ফাইয়ূম প্রভৃতি মিসরের নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির অন্যতম প্রত্নস্থান।

মিসরীয় সভ্যতার লিপি ছিল চিত্রলিপি। এই লিপি এই সভ্যতার বিভিন্ন স্থাপত্যে যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় পাথরে আর সেই সময়ে তৈরি করা প্রথম কাগজে। এই কাগজের নাম ছিল প্যাপিরাস। এই লিপির নাম হায়ারোগ্লিফিক। অনেক পরে আবিষ্কৃত রোজেটা পাথরে হায়ারোগ্লিফিকসহ মোট তিনটি ভাষায় কিছু বিষয় লিখিত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় এই লিপি পড়া সম্ভব হয়েছিল। হায়ারোগ্লিফিক শব্দের সাধারণ অর্থ হলো 'পবিত্র লিপি'। এগুলো ছিল মূলত চিত্রলিপি। মিসরীয়রা এই ধরনের সর্বমোট ৭৫০টি চিত্রলিপির ব্যবহার জানতো। বিভিন্ন স্থান থেকেই প্রচুর পরিমাণে হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে লেখা তথ্য পাওয়া যাওয়ায় মিসরীয় সভ্যতার সমাজ, রাষ্ট্র, শাসন, ও ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে।

অবস্থান ও সময়কাল:

মিসরীয় সভ্যতা আফ্রিকা মহাদেশের মিসরে নীল নদ অববাহিকায় বিকশিত হয়েছিল। এর দক্ষিণে নুবিয়ার মরুভূমি, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে লিবিয়ার সাহারা মরুভূমি এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগর রয়েছে। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীল নদটি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে উৎপত্তি লাভ করে নানা দেশ হয়ে মিসরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। এর প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে মিসরের দক্ষিণাঞ্চলকে উচ্চ মিসর ও উত্তরাঞ্চলকে নিম্ন মিসর বলা হয়ে থাকে। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে মিসরীয়দের ধর্ম, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও নীল নদের প্রভাব ছিল। এর সত্যতা অনুধাবন করে ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিসর দেখেছেন, সে অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন যে, এটি একটি স্বোপার্জিত দেশ, নীল নদের দান।' মিসরের প্রাণ নীল নদের কারণে মানবসভ্যতার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতার সূচনা হয়েছিল।

সময়কাল:

মিসরীয় সভ্যতা আনু: ৩১৫০ প্রাক-সাধারণ অব্দ থেকে আনু: ৩০ প্রাক-সাধারণ অব্দ পর্যন্ত ৩০০০ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল।

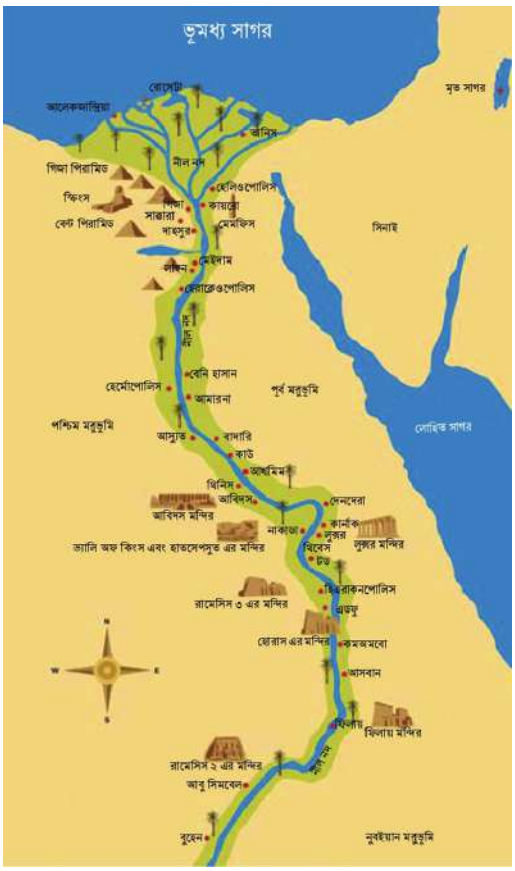

নীল নদের প্রবাহ ধরে মিশরের গুরুত্বপূর্ণ নগর ও প্রত্নস্থান (www.final.ie)

নদী ও বদ্বীপ

নদী সাধারণত মিষ্টি জলের একটি প্রাকৃতিক জলধারা যা ঝরনাধারা, বরফগলিত স্রোত যা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে প্রবাহ শেষে সাগর, মহাসাগর, হ্রদ বা অন্য কোন নদী বা জলাশয়ে পতিত হয়। যদিও নদীগুলি পৃথিবীর মোট জলভাগের একটি ক্ষুদ্র অংশ ধারণ করে, তবুও তারা মানব সভ্যতার জন্য সর্বদা অপরিহার্য। নদীগুলি সারা পৃথিবীজুড়ে মানুষ, গাছপালা এবং প্রাণীদের কাছে মিষ্টি পানির এক উৎস হিসেবে কাজ করে। তারা উপত্যকা এবং গিরিখাত খোদাই করে ভূমিকে আকার দেয়।

নদীগুলো কীভাবে প্রবাহিত হয়

একটি নদী উঁচু ভূমিতে পানির একটি ছোট ধারা হিসেব শুরু হয়। এ পানি বৃষ্টিপাত থেকে, তুষার বা বরফ গলে, অথবা একটি ঝরনার মাধ্যমে ভূগর্ভ থেকে আসতে পারে। উঁচু ভূমির গতিপথে নদী দ্রুত প্রবাহিত হয়। এটি জমি কেটে মাটি ও নুড়ি তুলে নেয়। হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, নদী এভাবে গিরিখাত এবং গভীর উপত্যকা তৈরি করে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো মালভূমি নদী দ্বারা গঠিত এবং একটি নদী পৃথিবীরপৃষ্ঠে কী ধরনের পরিবর্তন করতে পারে তা দেখায় আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের নিচে জাম্বেজির বিশাল গিরিখাত।

মাঝপথে নদীটি মৃদু ঢাল বেয়ে প্রবাহিত হয়। এটা তখন বড় এবং ধীর গতির হয়। তখন মাটি, নুড়ি এবং বালির নিচে তলিয়ে যেতে শুরু করে। এই উপাদানের কিছু অংশ দ্বীপ গঠন করে।

সবশেষে নিম্ন গতিপথে নদী আরও ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়। তখন আরও কঠিন উপাদানগুলো তলানিতে চলে যেতে শুরু করে এবং কিছু কিছু উপাদান নদীর মুখের দিকে বাহিত হয়– যেখানে নদী সমুদ্রে প্রবেশ করে। এই উপাদানগুলোই একত্রিত হয়ে একসময় বদ্বীপ নামক ভূমি তৈরি করে। তোমরা কি জানো আমাদের বাংলাদেশ ও এমনই একটা বদ্বীপ?

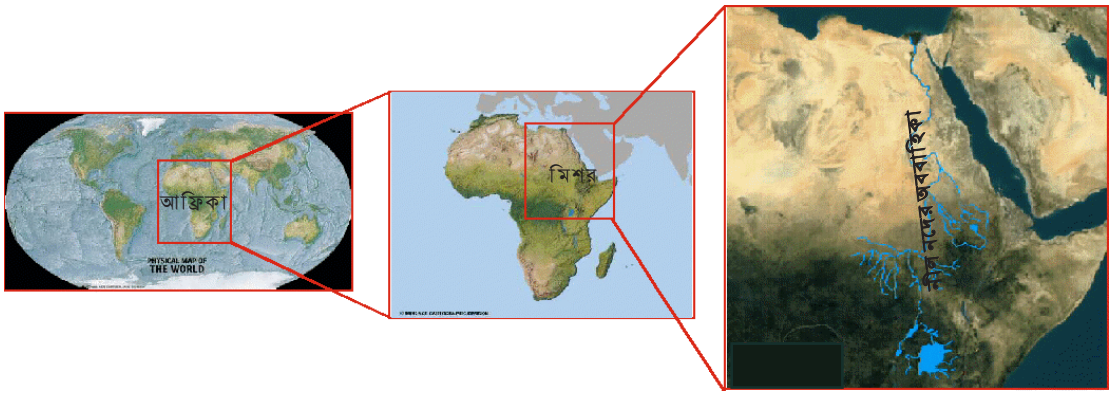

বিশ্বের মানচিত্রে মিসরের অবস্থান

এই বই-এ বিভিন্ন মানচিত্র দেওয়া আছে। চলো আমরা নিজে নিজে আফ্রিকা মহাদেশের একটি বড় মানচিত্র এঁকে তার উত্তর, দক্ষিন, পূর্ব, পশ্চিমে কী কী আছে তা মানচিত্রে চিহ্নিত করি। এরপর দুটি ভিন্ন রং দিয়ে উচ্চ আর নিম্ন মিশরকে আলাদা করি:-

মিসরের তৎকালীন সামাজিক স্তরবিন্যাস। সবার উপরে ফারাও আর ফারাওয়ের নিচে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পেশার মানুষ অনেকটা পিরামিডের মতন বিস্তৃত।

সমাজব্যবস্থা:

প্রাচীন মিসরের সমাজব্যবস্থায় তিনটি শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। এগুলো হলো-

উচ্চশ্রেণি: এই শ্রেণিভুক্ত ছিল রাজপরিবার, অভিজাত গোষ্ঠী, পুরোহিত গোষ্ঠী প্রভৃতি।

মধ্যশ্রেণি: এই শ্রেণিভুক্ত ছিল বণিক ও কারিগর গোষ্ঠীর মানুষ।

নিম্নশ্রেণি: মূলত কৃষক ও ভূমিদাসেরা এই শ্রেণিভুক্ত ছিল।

নারীর অবস্থান: প্রাচীন মিসরের সমাজে নারীরা উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। সমাজের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা পুরুষদের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। মাতৃতান্ত্রিক নিয়মে ছেলে ও মেয়েরা মায়ের কাছ থেকেই মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ করতো। রাজপরিবারের রক্ত যাতে বাইরে না যায় তার জন্য ভ্রাতা-ভগ্নির মধ্যে বিবাহের রীতি চালু ছিল।

রাজনৈতিক ইতিহাস:

মিসরীয়দের শাসকের উপাধি ছিল ফারাও। তারা নিজেদের সূর্যদেবতা 'রা' বা 'আমন রে'-এর সন্তান মনে করতেন এবং তিনি তার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য শাসন করতেন। প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল। তবে আনু: ৩৫০০ প্রাক-সাধারণ অব্দে মিসরীয়রা যে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় নার্মার প্লেটে, যেটি রাজা নার্মারের প্রসাধনী রাখার পাত্র ছিল। এর এক পাশে রাজা মেনেস বা নার্মারকে বেলুন আকৃতির মুকুট পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়; যেটি উচ্চ মিসরের প্রতীক। আর প্লেটের অপর পাশে তাকে লাল মুকুট পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, যেটি নিম্ন মিসরের প্রতীক। তিনিই প্রথম দুটো মিসরকে একত্রিত করেন, যার রাজধানী ছিল উচ্চ মিসরের মেম্ফিসে। প্রাচীন মিসরে ৩১টি রাজবংশ প্রায় ৩০০০ বছর ধরে রাজত্ব করেন।

মন্দির ও ভাস্কর্য :

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় পরের দিকে পিরামিডের বদলে বহু ধর্ম মন্দির তৈরি হয়। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল কার্নাক ও লাকজোরের মন্দির। মিসরের অপর উল্লেখযোগ্য শিল্প-নিদর্শন হলো আবুসিম্বেল-এর মন্দির এবং বিশালাকার 'স্ফিংস'-এর মূর্তি। এ ছাড়াও এগুলোতে বিশালাকার ভাস্কর্যের সমন্বয় ঘটেছে।

অর্থনীতি:

কৃষি, পশুপালন ও শিল্প-বাণিজ্যের ওপর মিসরের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল। নীলনদের উভয় তীরের উর্বর ভূমিতে কৃষিকাজ হতো। এসময় গম, যব, তিসি, ভুট্টা, শাকসবজি ও শণ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। তাদের প্রধান প্রধান গৃহপালিত পশু ছিল ছাগল, ভেড়া, গরু, শূকর প্রভৃতি। নীল নদের উভয় তীরের তৃণভূমি অঞ্চলে পশুচারণ ও পশুখাদ্যের সুবিধা মিলেছিল। প্রাচীন মিসরে মৃৎশিল্প, কোচ শিল্প, বস্ত্রবয়ন শিল্প এবং নৌযান তৈরির শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। ইজিয়ান দ্বীপ, ক্রিট ছাড়াও সিরিয়া, ফিনিসিয়া, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মিসরবাসী বাণিজ্য চালাতো। বাণিজ্যের বিনিময় মাধ্যম হিসেবে তারা তামা ও সোনার মুদ্রা ব্যবহার করতো। তাদের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল গম, লিনেন কাপড়, স্বর্ণালংকার, সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র প্রভৃতি। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উটপাখির পালক, হাতির দাঁত, ধাতুর অস্ত্র, মসলা, কাঠ, সোনা, রুপা প্রভৃতি।

ছাগল প্রজনন এবং গবাদিপশুর খাল পার করানোর দৃশ্যের চিত্র (slideshare.net)

ধর্ম:

মিসরীয়দের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। স্বল্প সময়ের জন্য 'একেশ্বরবাদে' এ বিশ্বাস করলেও তারা ছিলেন মূলত 'বহুঈশ্বরবাদে' বিশ্বাসী। মিসরীয়দের প্রধান দেবতা ছিল 'রা' বা 'আমন রে'। নীল নদের দেবতা ওসিরিস, মাতৃত্বের দেবী আইসিস প্রভৃতি ছাড়াও অনেক দেব-দেবী রয়েছেন। প্রাচীন মিশরীয়দের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ ছিল 'মৃতের বই' (Book of the Dead)। সমাহিত মৃতদেহের পাশে প্যাপিরাসে লেখা এই ধরনের সাহিত্য নিদর্শন মিলেছে। এই পুস্তকগুলোতে জাদুবিদ্যা, ধর্মীয় শ্লোক ও প্রার্থনা, ঔষধপত্র প্রভৃতির আলোচনা থাকতো।

বর্ষপঞ্জি:

প্রাচীন মিসরবাসী কৃষির প্রয়োজনে প্রথমে চন্দ্রের অবস্থানের ভিত্তিতে চন্দ্রপঞ্জিকার উদ্ভাবন ও পরবর্তীকালে সৌরপঞ্জিকার আবিষ্কার ঘটায়।

চুনা পাথরের উপর অঙ্কিত জলহস্তী শিকারের চিত্র, সাক্কারা, মিসর

পিরামিড ও মমি:

প্রাচীন মিসরের অন্যতম স্থাপত্যকীর্তি হলো পিরামিড।

পোশাক–পরিচ্ছদ তৈরি, পরিধান ও ভূমিকাভিনয় :

ছবিতে প্রাচীন মিসরের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের পোশাক–আশাক লক্ষ করো। তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো (এখান থেকে পড়ে বা অন্য বই পড়ে অথবা ইন্টারনেট ঘেঁটে)। এবারে কাপড়, কাগজ, রং ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রাচীন মিসরের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের পোশাক, অলংকার ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করে সেগুলো পরে সে সময়কার কোনো কল্পিত ঘটনার অভিনয় করো। এমন একটি ঘটনা তৈরি করবে যেন তা সব শ্রেণির মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত করে।

ফারাও জোসের সময়ে স্থাপত্যশিল্পী ইমহাটেপ সর্বপ্রথম জোসের সমাধিস্থলের ওপর মিসরের পিরামিডটি তৈরি করেন। মিসরের সর্ববৃহৎ পিরামিডটি হলো খুফুর পিরামিড। অন্যান্য কয়েকটি বিখ্যাত পিরামিড হলো নেফরা পিরামিড, মেনকুরা পিরামিড, তুতেনখামেনের পিরামিড ইত্যাদি। মিসরের অক্ষত মমিগুলো আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রতি একটি বিস্ময়কর চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এগুলো তৈরির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা শারীরবিদ্যার

জ্ঞান লাভ করেছিল। ফারাওদেরসহ নানা উচ্চশ্রেণির মানুষের শরীর মমি করে বিশেষ পদ্ধতি সংরক্ষণ করে রাখা হতো। এমন কয়েকটি মমি সংরক্ষণ করাসহ ফারাওদের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে জীবিত অবস্থার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বিশ্বাস থেকেই পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছিল। পিরামিডে মমির পাশাপাশি আরও নানা ধরনের বস্তু, দেয়াল চিত্র আর ব্যবহার্য জিনিসপত্র উৎসর্গ করা হতো।

মমি

বিজ্ঞান:

প্রাচীন মিসরে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতি ঘটেছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে মিসরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো 'মেটেরিয়া মেডিকা' (Materia Medica)' বা ওষুধের সূচি প্রস্তুতকরণ।

পিরামিডগুলো যখন মিসরের গিজার জনজীবনের অংশ ছিল, তখনকার কাল্পনিক চিত্র। নীল নদ, জনবসতি, মন্দিরসহ নানা স্থাপত্য, স্তম্ভের মতন স্থাপনা (ওবেলিসক) সহ তখন বসতিটি কেমন ছিল তা শিল্পীরা কল্পনা করে এঁকেছেন।

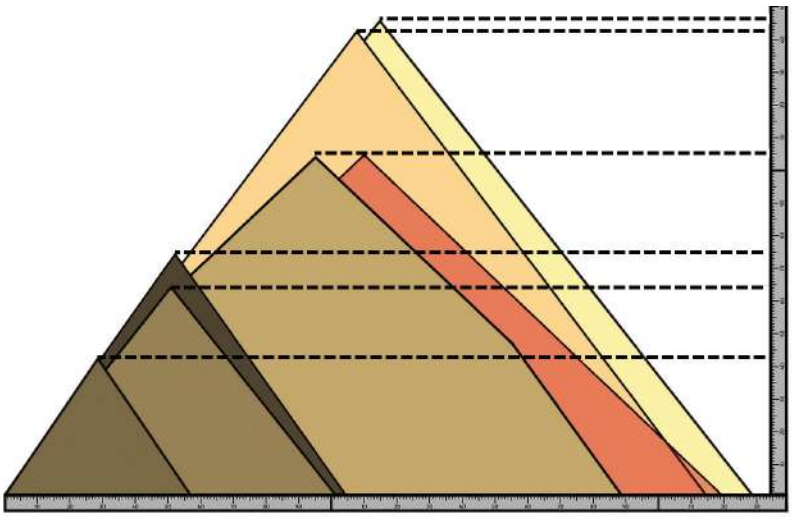

ছোট থেকে বড় পিরামিডগুলোর উচ্চতা আর নাম। ফারাও খুফু ও ফারাও খাফরার স্মরণে তৈরি পিরামিড দুটো সবচেয়ে উঁচু। আর ফারাও উনাসের পিরামিড সবচেয়ে ছোট।

শবদেহ থেকে মমি তৈরি করে কফিনে রাখা বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটতো। কফিনটি মৃতদেহের শ্রেণি ও ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন উপাদান, অলংকরণ আর ধর্মাচার অনুসারে তৈরি হতো। তারপরে কফিনটি একটি বাক্সে রাখা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাক্সটি পাথরের হতো। এ ধরনের বাক্সকে সারকোফাগাই বলা হয়। বাক্সটিকে কবরের কক্ষে রাখা হতো।

মমি তৈরির পদ্ধতিটি ছবিতে দেয়া আছে। ছবিগুলো দেখে চলো আমরা এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলো লেখার চেষ্টা করি।

মৃতদেহকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রূপান্তর, পরিবর্তন, রাসায়নিক ব্যবহার করে, কাপড়ের পরতে পরতে আবৃত করে কয়েকটি ধাপে অনেক সময় ধরে মমিতে পরিণত করা হতো। উপরের ছবিতে তেমনই কয়েকটি ধাপ গবেষণার মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

মিসরীয় সভ্যতায় কীভাবে মমি তৈরি করা হতো, আর কেনই বা এই মমি এত দিন ধরে টিকে আছে– তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও ইতিহাসবিদগণ বিভিন্ন গবেষণা করে চলেছেন। অনেক মমি পাওয়া গেছে। তবে এসব মমির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে ফারাও তুতেনখামেন বা রাজা তুতের মমি। তিনি মাত্র ৯ বছর বয়সে ফারাও হন প্রাক সাধারণ ১৪৩৩ অব্দে আর রাজত্ব করেন ১৪২৩ অব্দ পর্যন্ত। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি মৃতুবরণ করেন। গবেষকগণ তার মমি করা দেহের অবশেষ ও কঙ্কাল নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, তুতের একটি পা জন্মগতভাবেই বাঁকানো ছিল। তিনি কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে মারা গিয়েছিলেন। এই ছবিতে তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষ থেকে ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত তুতেনখামেনের কফিনের পুরো ছবি আর তার মুখায়ববের কফিনে তৈরি করা চিত্র দেখানো হয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার ১৯২২ সালে তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষে প্রবেশ করে তার কফিন এবং সমাধিতে উৎসর্গ করা অসংখ্য মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করেন।

বুক অব ডেড বা পরলোকগতদের বইয়ে প্যাপিরাসে চিত্রিত পরলোকে যাত্রার চিত্রাবলি। হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে লেখা। (pixels.com)

তুতেনখামেন

তুতেনখামেনের সমাধি কক্ষ ও কফিন।

কাছে কোনো পাথরের উৎস ছিল না। ছিল না কোনো যন্ত্র বা আধুনিক প্রযুক্তি। তারপরেও কীভাবে মিসরীররা পিরামিড তৈরি করেছিলেন? বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে এই জটিল স্থাপত্যগুলো নির্মাণের প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। প্রথমে নীল নদের মাধ্যমে জাহাজে বহন করে পাথর নিয়ে আসা হতো পিরামিড তৈরি করার জন্য।

জাহাজ থেকে পাথরের টুকরাগুলো কীভাবে নিয়ে আসা হতো পিরামিড নির্মাণ করার স্থানে? ছবি দেখে তোমরা বলতে পারবে?

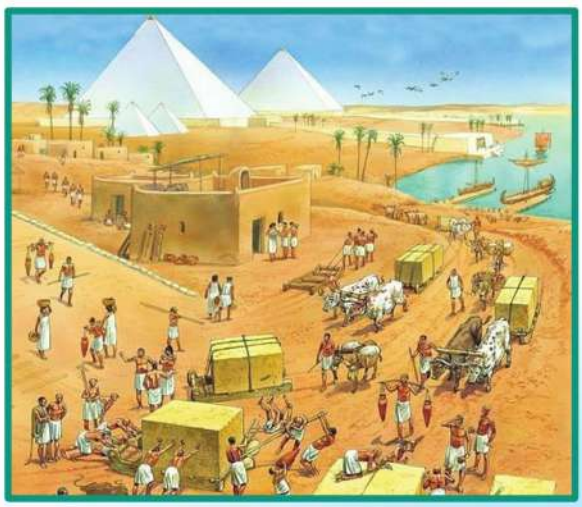

জাহাজ থেকে কাঠ বসিয়ে একদিক থেকে নিচ দিয়ে চাপ দিয়ে তুলে ধরে অন্যদিক থেকে দড়ি দিয়ে অনেকে মিলে টেনে পাথরের টুকরাগুলোকে পিরামিড তৈরি করার স্থানের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো।

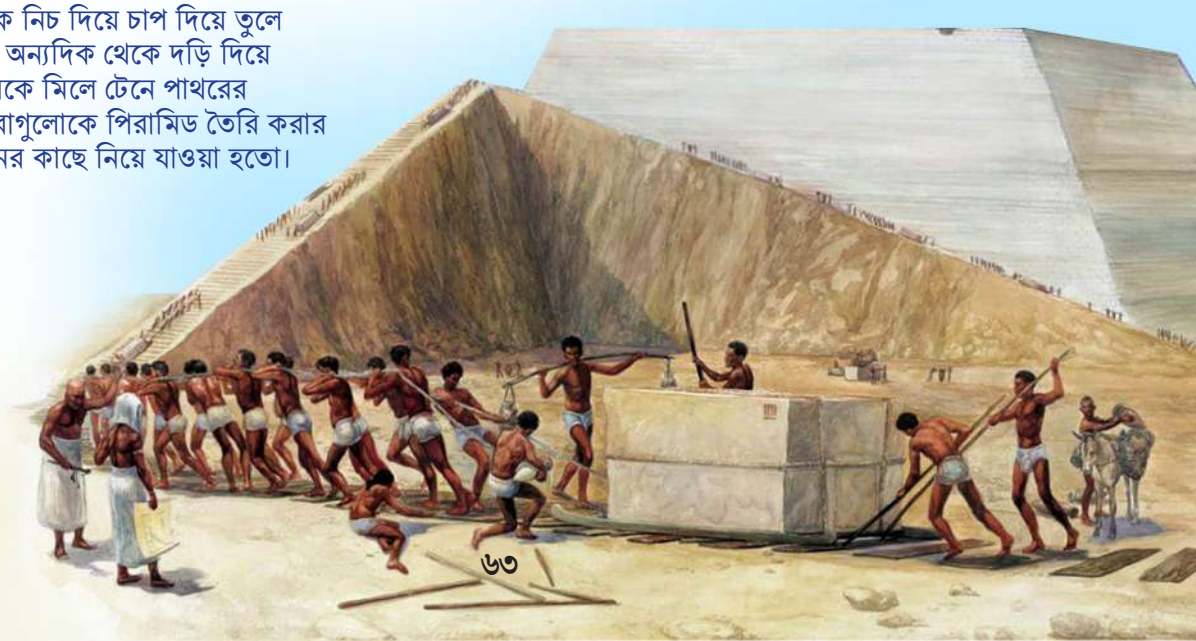

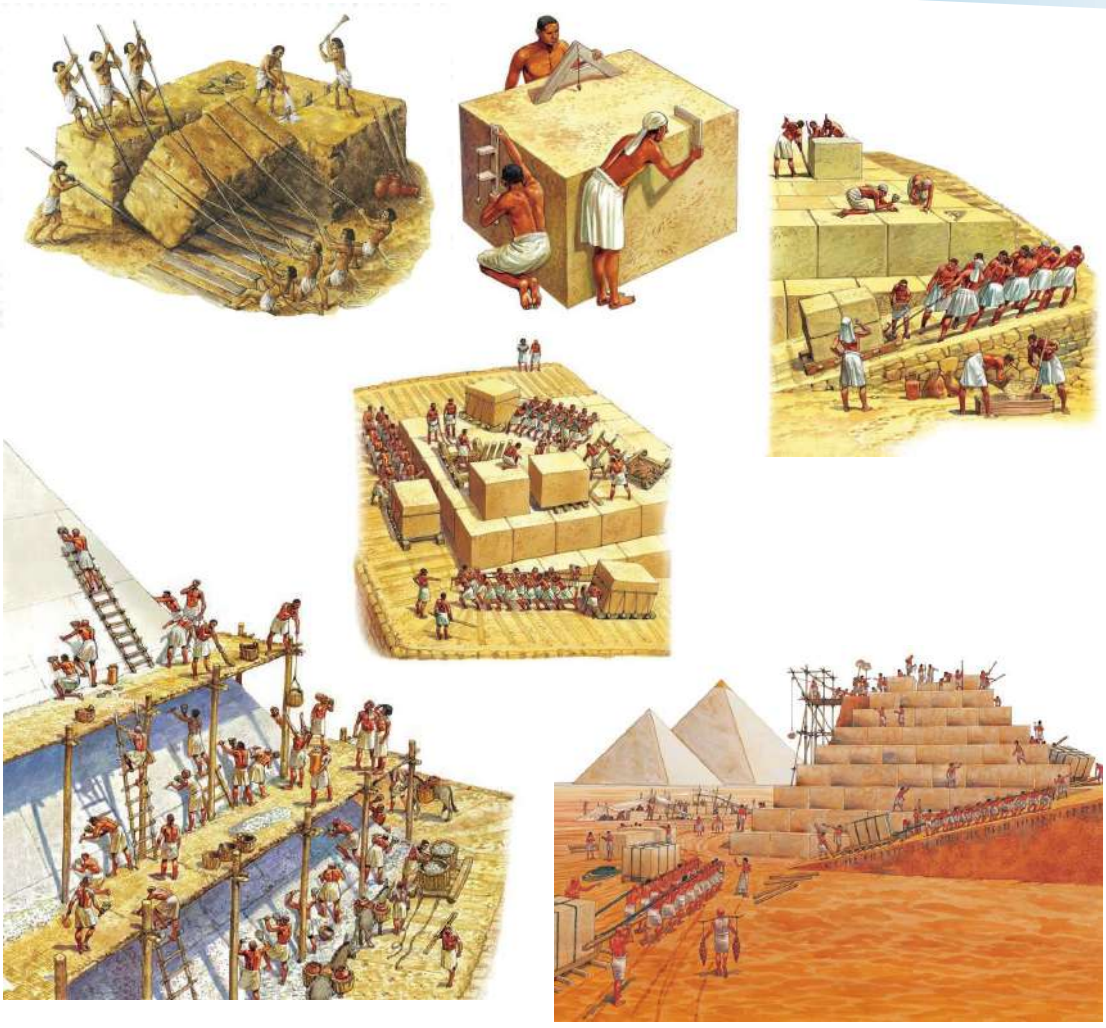

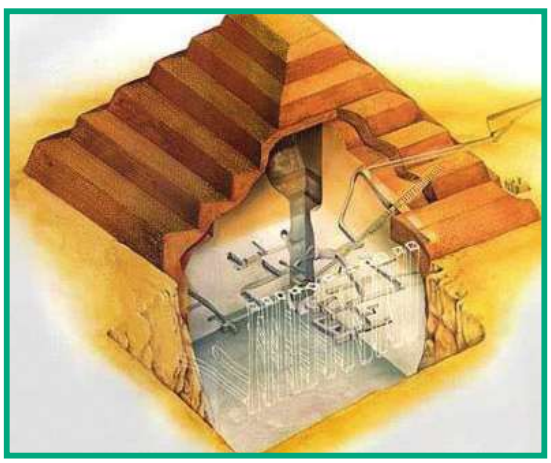

পিরামিডের ভিতরের দেখতে কেমন ছিল।

পিরামিড নির্মাণের বিভিন্ন ধাপ :
পাথর মেপে, কেটে দরকারী আকার দিয়ে পিরামিড তৈরির উপযোগী করা হত। একটা পাথরের উপরে আরেকটা পাথরের টুকরো বসানো হত। দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে উপরের দিকে পাথরের টুকরাগুলোকে উঠানো হত। একটার উপরে আরেকটা স্থাপন করা হত। পিরামিড তৈরির এই প্রক্রিয়ার প্রচুর শ্রমিক দরকার হত। গবেষকগণ মনে করেন, বড় আকারের একটা পিরামিড তৈরি করতে ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ জন শ্রমিক প্রয়োজন হত। এই শ্রমিকগণের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত নির্মাণ স্থানের কাছে। উপরের ছবি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ কল্পনা করে আঁকা হয়েছে।

বিখ্যাত স্ফিংস ভাস্কর্য, গিজা, মিশর। মিশরীয় সভ্যতার বিভিন্ন ফারাওয়ের শাসনামলে এই ভাস্কর্যের অর্থ পাল্টেছে। স্ফিংকস হলো একটি কাল্পনিক প্রাণী, যার মাথা পুরুষের আর শরীর সিংহের। একে ইহকাল ও পরকালের অভিবাবক মনে করা হত। গিজার এই স্ফিংকস মিশরীয় সভ্যতার সময়েই কয়েকবার বালির নিচে চাপা পড়েছিল। ফারাওগণ খনন করে আবার এই ভাস্কর্য উদ্ধার করেছেন। ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করে এই কাল্পনিক প্রাণীটিতে একসময় সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা মনে করা হতো। ফারওগণের সঙ্গে এই ভাস্কর্যকে একই ক্ষমতা আরোপ করা হত। নগরের ও সাম্রাজ্যের রক্ষক হিসেবে আর সূর্যদেবতার একটি রূপ হিসেবেও স্ফিংকস ফারাওদের অলৌকিক ও স্বর্গীয় ক্ষমতার প্রতীক ছিল।

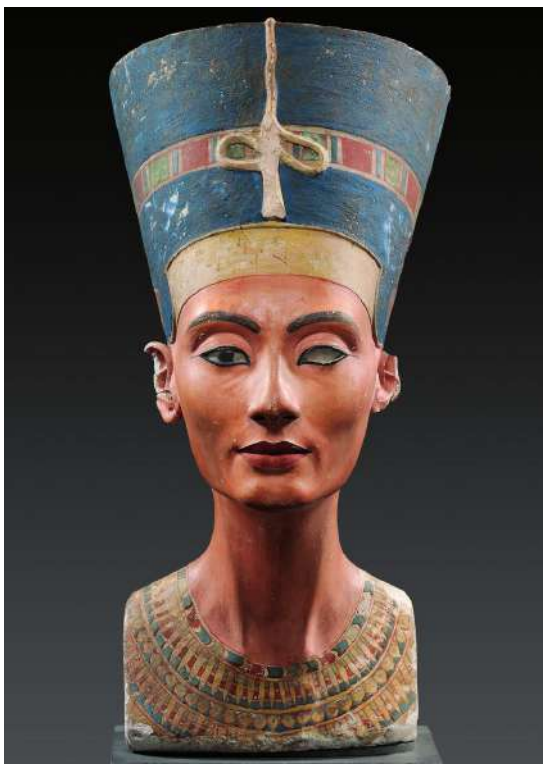

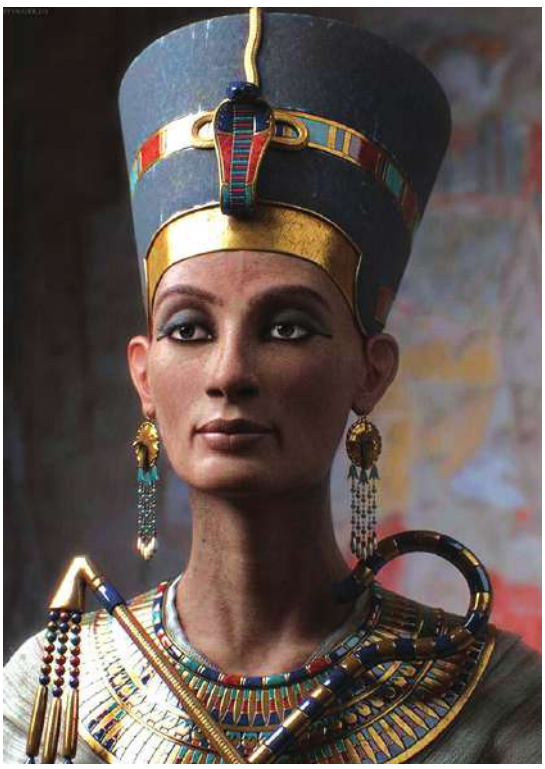

রাজা আখেনাতেন এবং রাণি নেফারতিতি মিসরের জীবনযাপনে বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। নেফারতিতির সমাধি-মন্দির খুব বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন। উপরে বামে নেফারতিতির মুখায়ববের ভাস্কর্য আর ডানে শিল্পীর কল্পনায় নেফারতিতির চেহারার পুনর্গঠিত চিত্র।

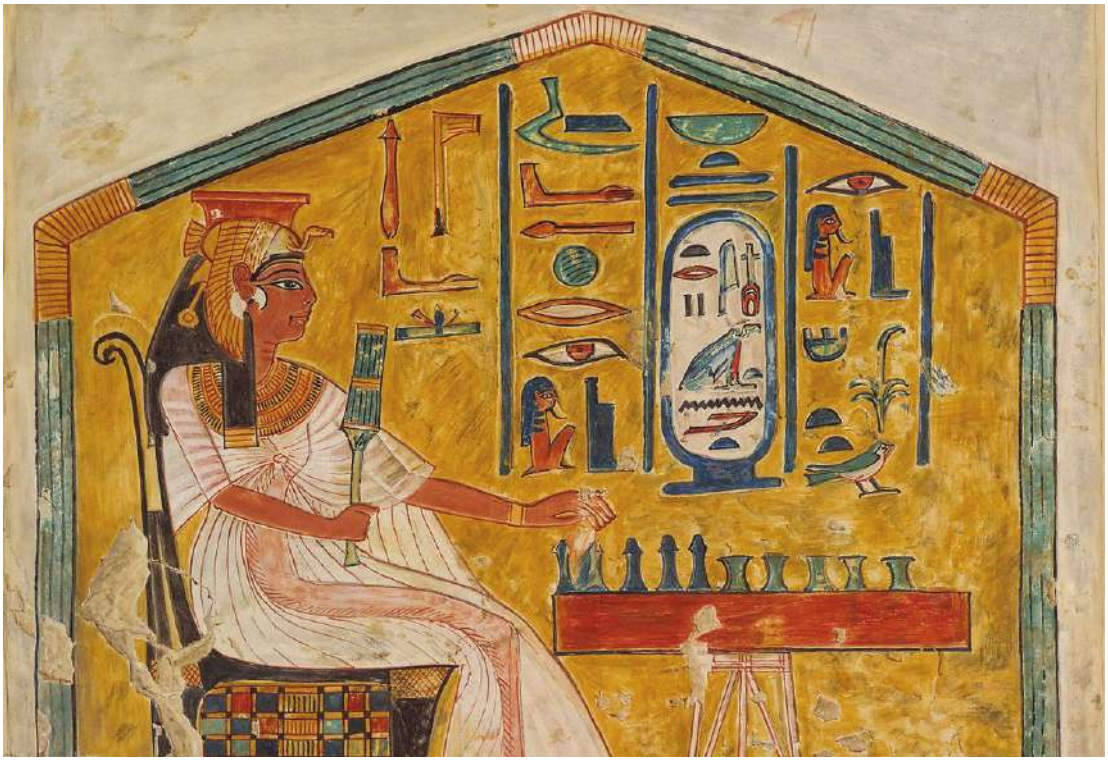

নেফারতিতির সমাধি-মন্দিরের দেয়ালে আঁকা চিত্রে দেখানো হয়েছে, তিনি বসে সেনেট নামের একটা খেলা খেলছেন। অনুমান করা হয়, খেলাটা বর্তমান দাবা খেলার মতন কোনো খেলা ছিল।

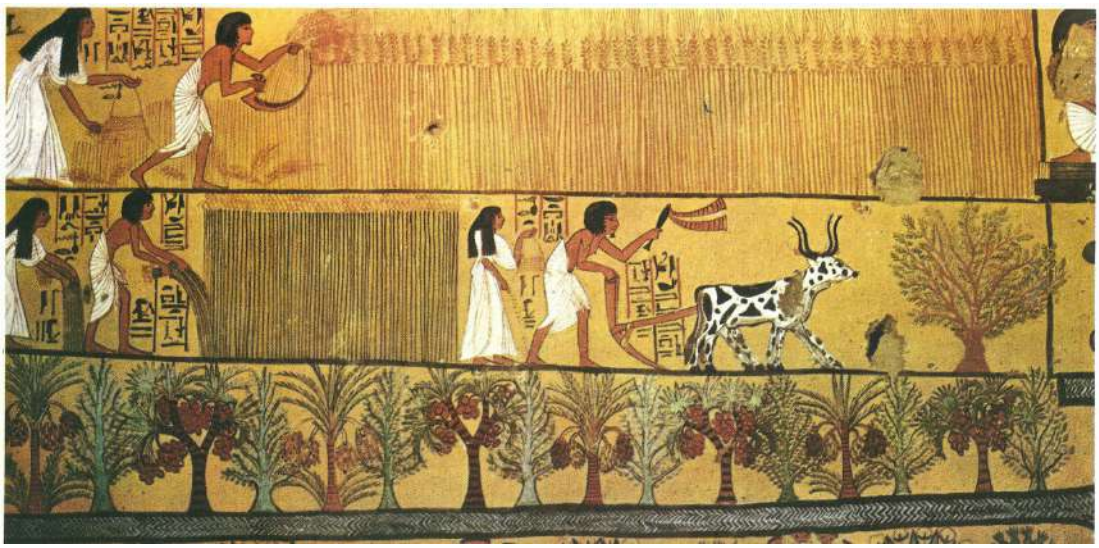

মিশরে চাষাবাদ কীভাবে করা হত? ফসল কীভাবে কাটা হত? খেঁজুর গাছ লাগানো হত। লাঙ্গল দিয়ে চাষাবাদ করা হচ্ছে। বীজ বপন করা হচ্ছে। শস্য কাটা হচ্ছে। নিচে খেজুর গাছে খেজুর ধরে আছে। এই ছবিগুলো দেয়ালে আঁকা হয়েছিল তখনকার মিশরে। আমাদের দেশের কৃষিকাজের সঙ্গে প্রায় ৪০০০ বছর আগের মিশরের চাষাবাদের মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত করতে পারো?

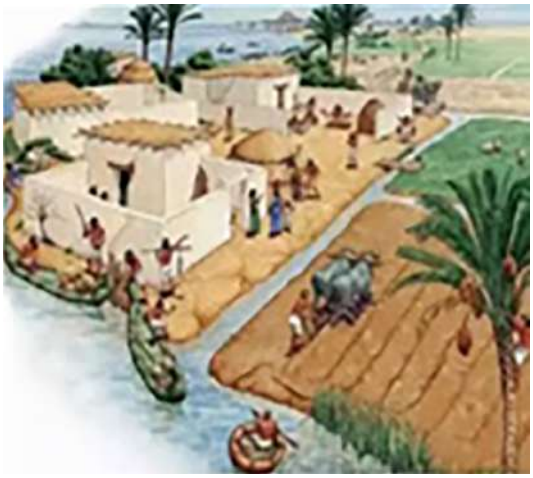

মিসরকে বলা হয় নীল নদের দান। নীল নদের প্রবাহ ও বন্যার কারণে যে বিশাল সমতলভূমি তৈরি হয়েছিল সেই উর্বর জমিতে বিভিন্নভাবে চাষাবাদ করা হতো। এই চাষাবাদই ছিল মিসরীয় সভ্যতা বিকাশের অন্যতম প্রধান প্রভাবক। উপরের ছবিতে লাঙল দিয়ে গরুর মাধ্যমে চাষাবাদ করা, বীজ বপন করার ছবি আছে। নীল নদের কাছে কীভাবে বসতিগুলোর চারপাশে জমি চাষাবাদ করে ফসল ফলানো হতো তার কাল্পনিক ছবি আছে। আরও আছে ছোট ছোট খাল বা নালা তৈরি করে পানি নিয়ে গিয়ে ঝুড়ি বা পাত্রের মাধ্যমে সেচ দেওয়ার চিত্র।

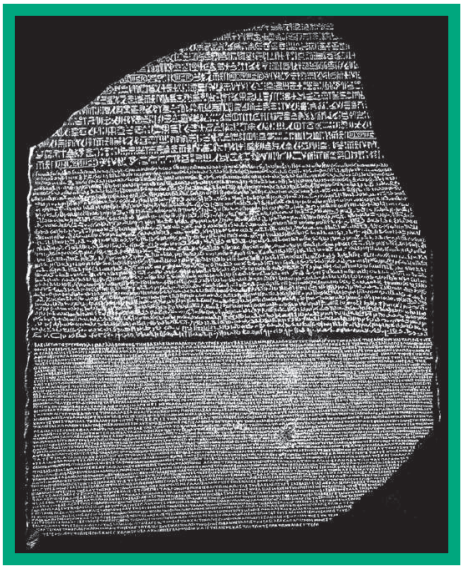

মিসরের লিখন পদ্ধতি ছিল চিত্রের মাধ্যমে তৈরি লিখন পদ্ধতি। এই লিপি হায়ারোগ্লিফিক নামে পরিচিত। ইতিহাসবিদগণ এই লিপি পড়তে পারতেন না এই প্রস্তর লিপিটা ছাড়া। পাথরের উপরে খোদাই করা প্রাক সাধারণ ১৯৬ অব্দে রাজা পঞ্চম টমেমি ইপিফানেসের পক্ষ থেকে জারি করা এই আদেশ তিনটি লিপিতে লেখা হয়েছে: হায়ারোগ্লিফিক, ডেমোটিক আর প্রাচীন গ্রিক। একই আদেশ তিন লিপিতে লেখা হয়েছিল বলেই এই পাথরের খণ্ডটি হয়ে উঠেছিল হায়ারোগ্লিফিক পড়ার চাবিকাঠি। মজার বিষয় হলো, এই পাথরের লিপিটি পরে বিভিন্ন স্থাপত্যে নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। নেপোলিয়নের মিসর দখলের জন্য যুদ্ধে যাত্রার সময় একজন ফরাসী সেনা এই লিপি আবারও খুঁজে পান ১৭৯৯ সালে।

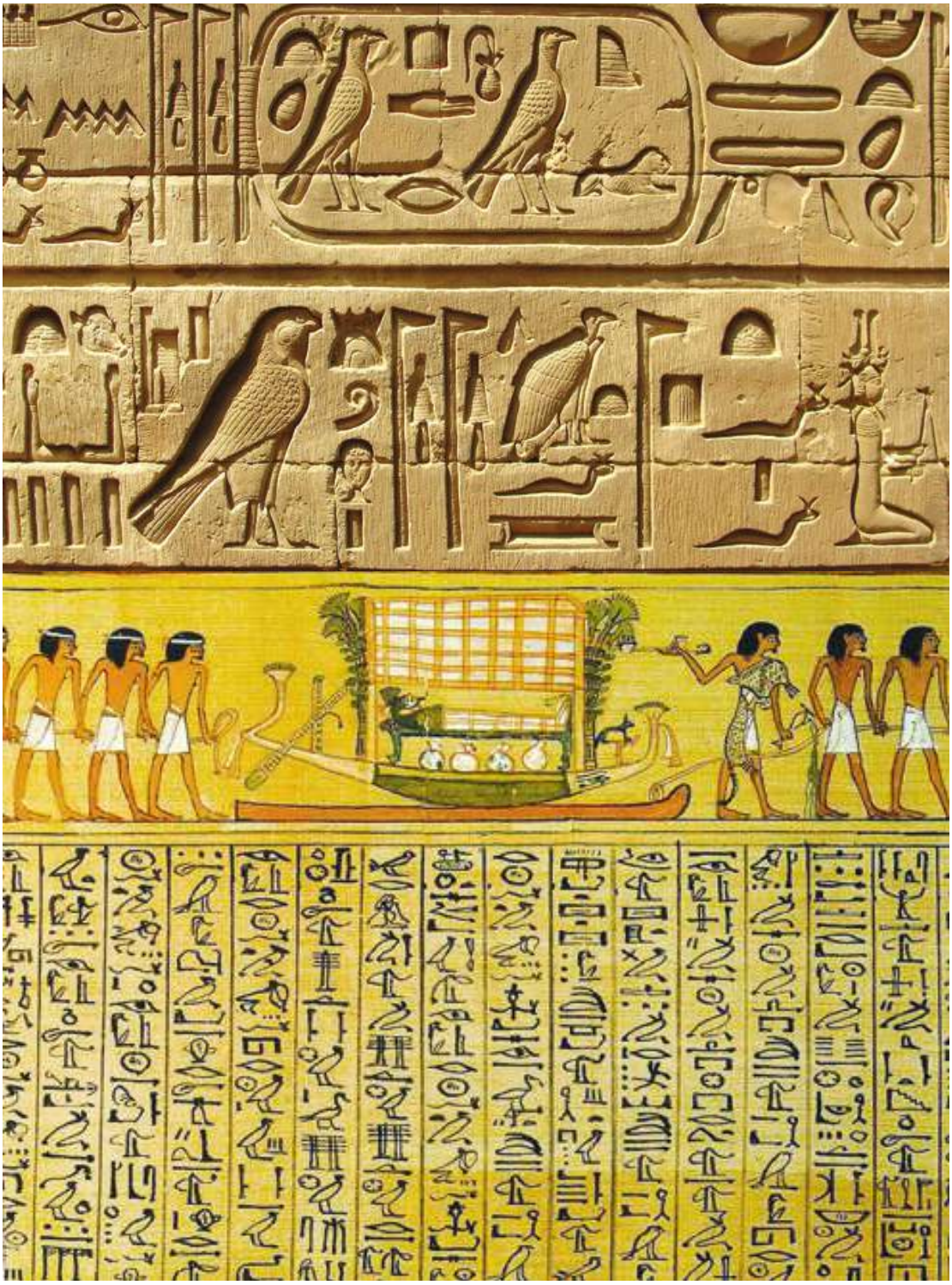

পাথরে খোদাই করা আর প্যাপিরাসে লেখা হায়ারোগ্লিফিক লিপি।

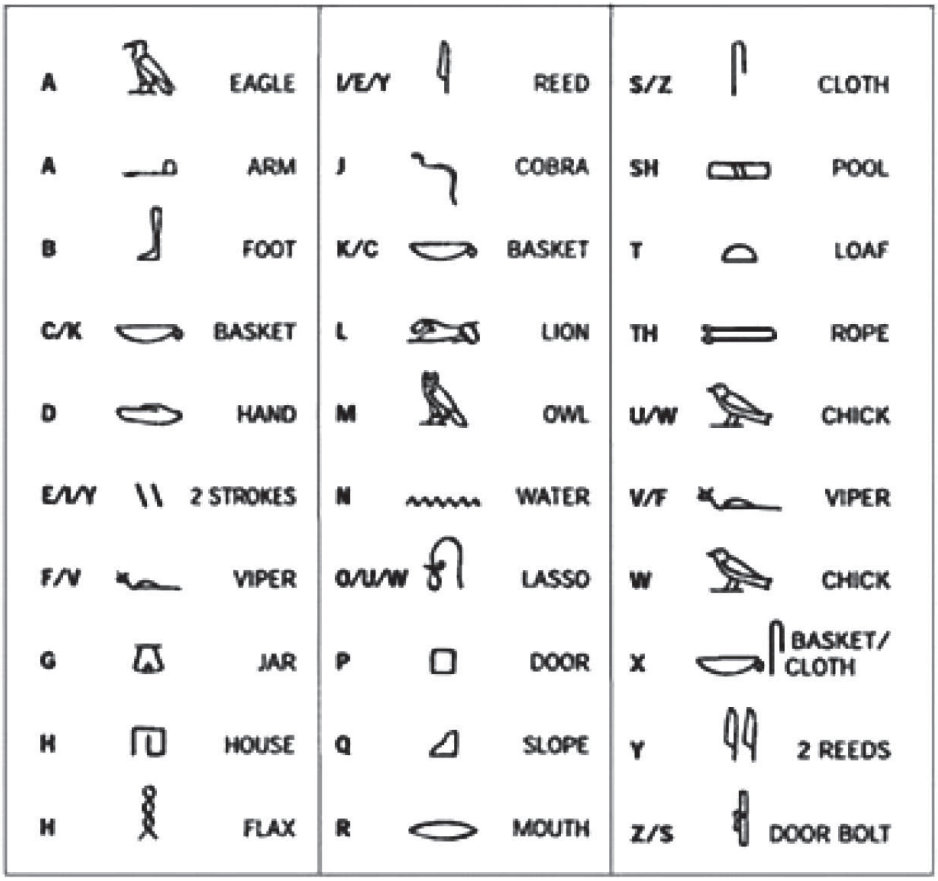

কয়েকটি হায়ারোগ্লিফিক চিত্রলিপির অর্থ দেওয়া হলো ইংরেজিতে। তোমরা খোদাই করা লিপির ছবির সঙ্গে মিলাতে পারো।

মিসরের একধরনের বাড়ি। বিভিন্ন শ্রেণি ও নগরের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন গড়নের বাড়িতে বসবাস করতেন। শিল্পী ও কপিরাইট: গুস্তাভ নর্ডগ্রিন (https://www.artstation.com/artwork/JlNzwz)

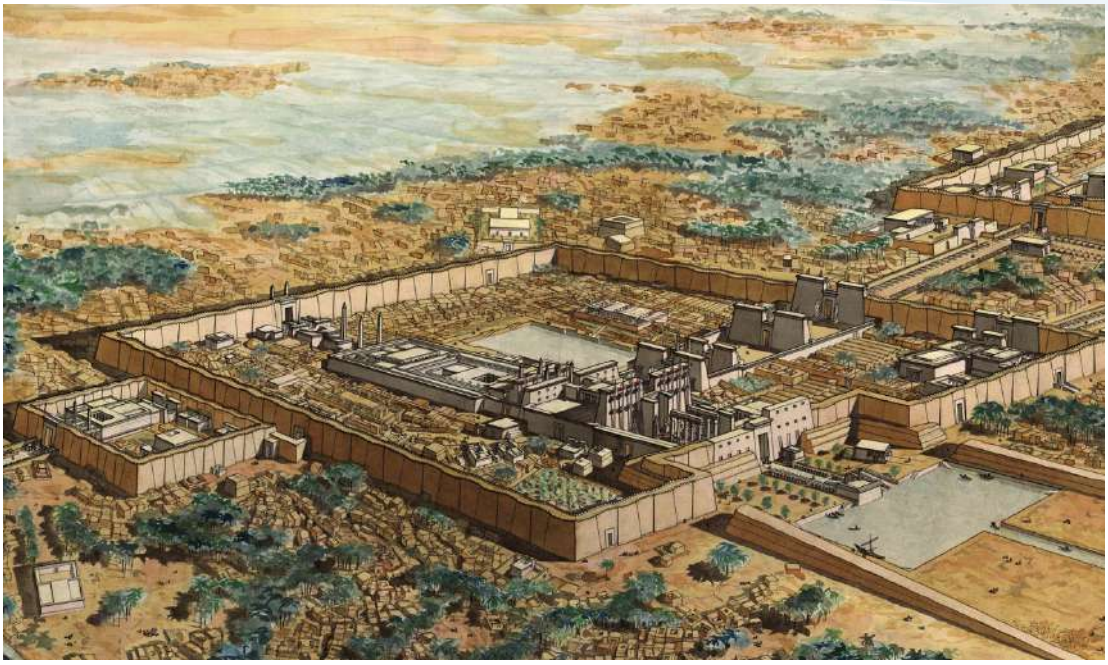

কারনাক থিবস নগরী-সংলগ্ন একটি নগর-অঞ্চল। কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

খারগা মরূদ্যান সংলগ্ন খারগা নগর। এই মরূদ্যান কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নগরটি সে সময়ের বাণিজ্যপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। (কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যঁ ক্লদ গোলভিন, (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

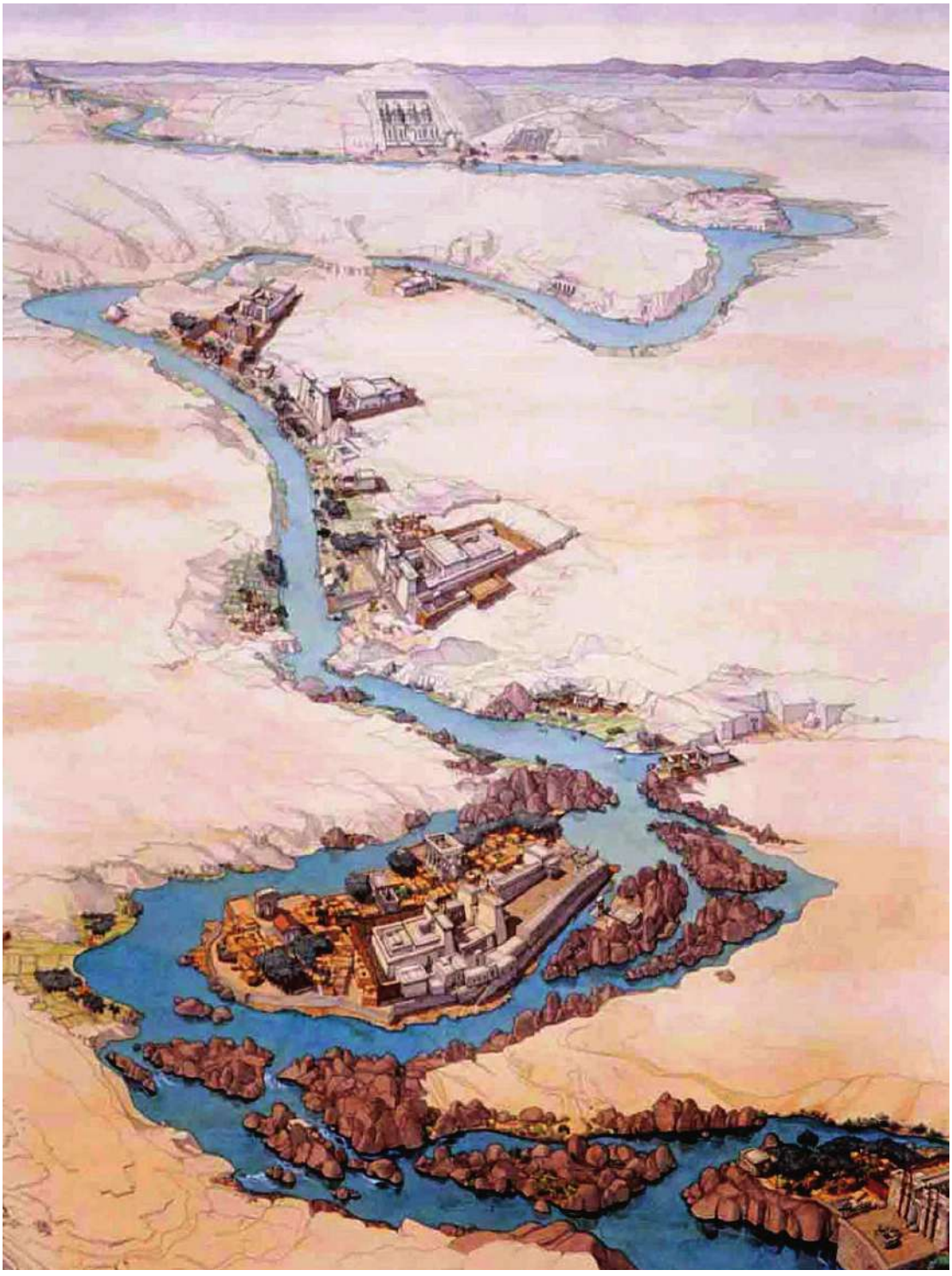

নীল নদের পাড়ে ও মধ্যে গড়ে তোলা থিবস নগর ও সংলগ্ন বিভিন্ন মন্দির ও স্থাপনা কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

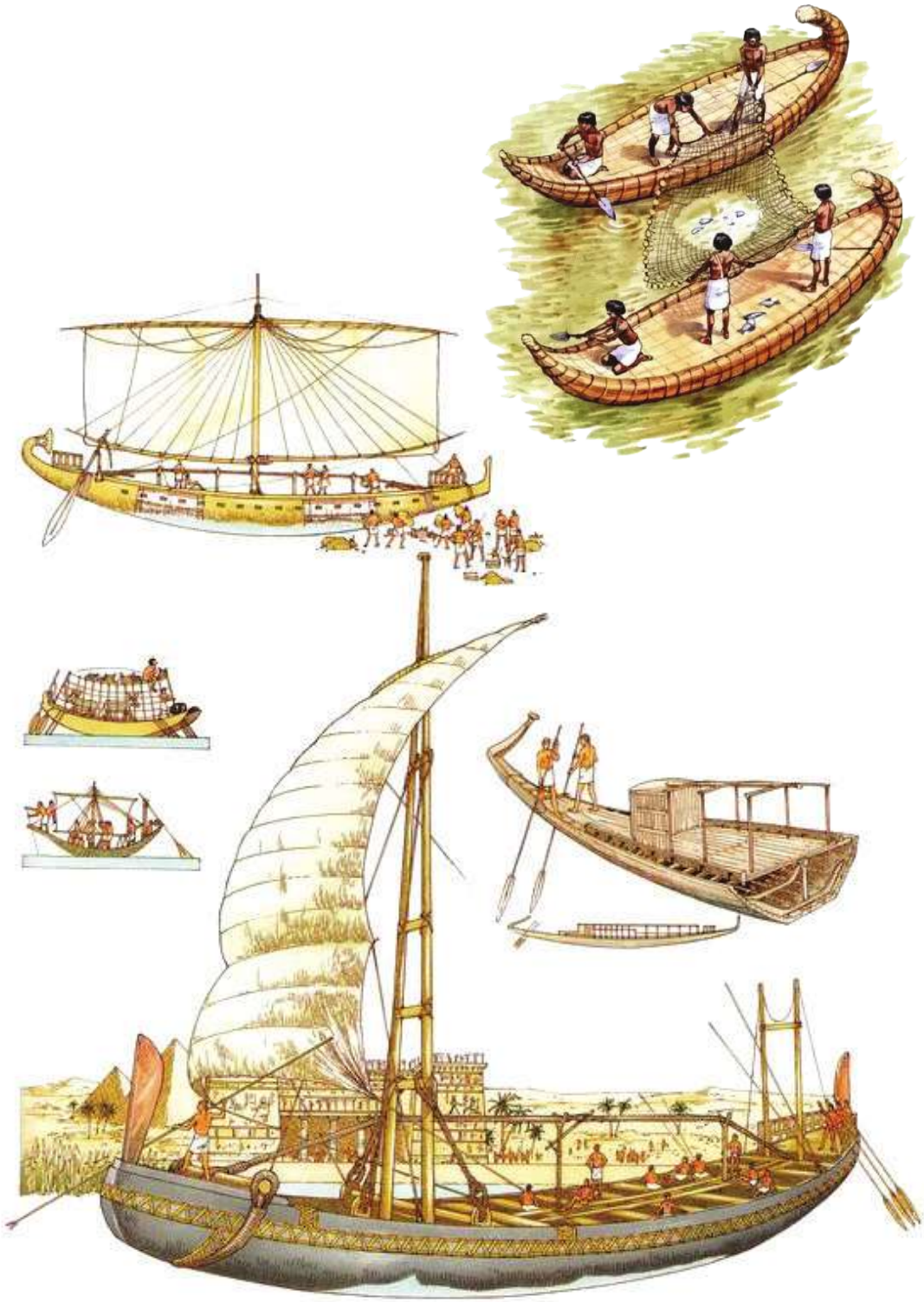

মিসরীয় সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত নৌকা ও জাহাজের ছবি।

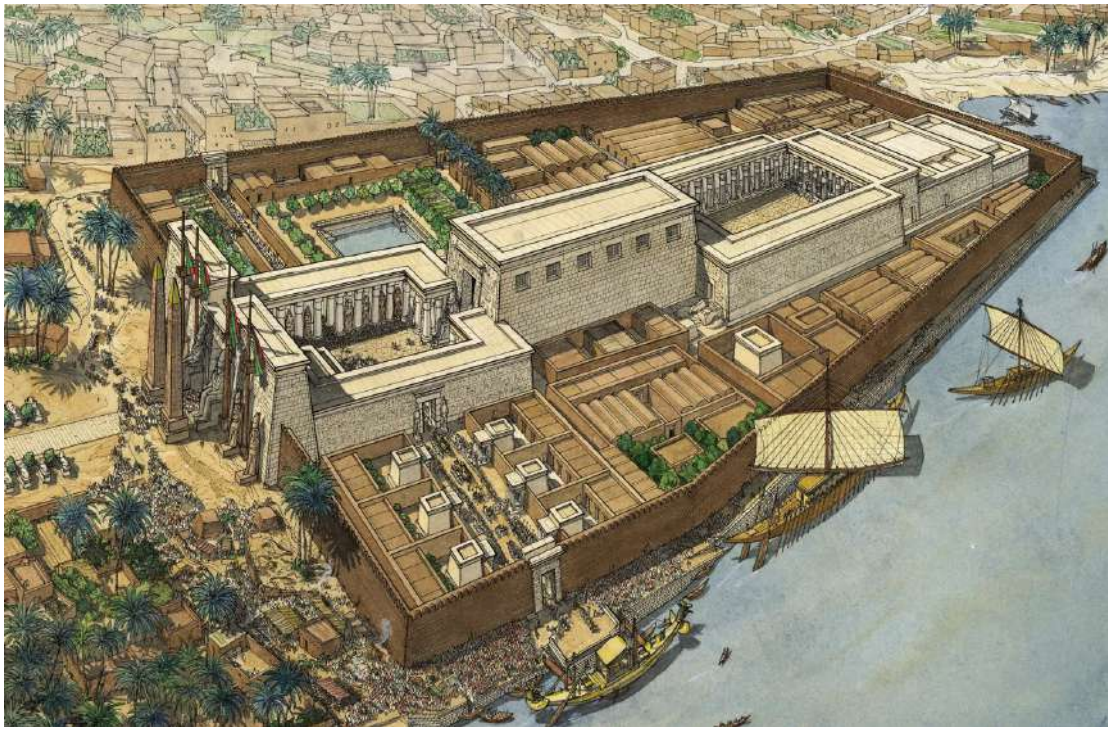

লুক্সরের বিখ্যাত মন্দির। কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

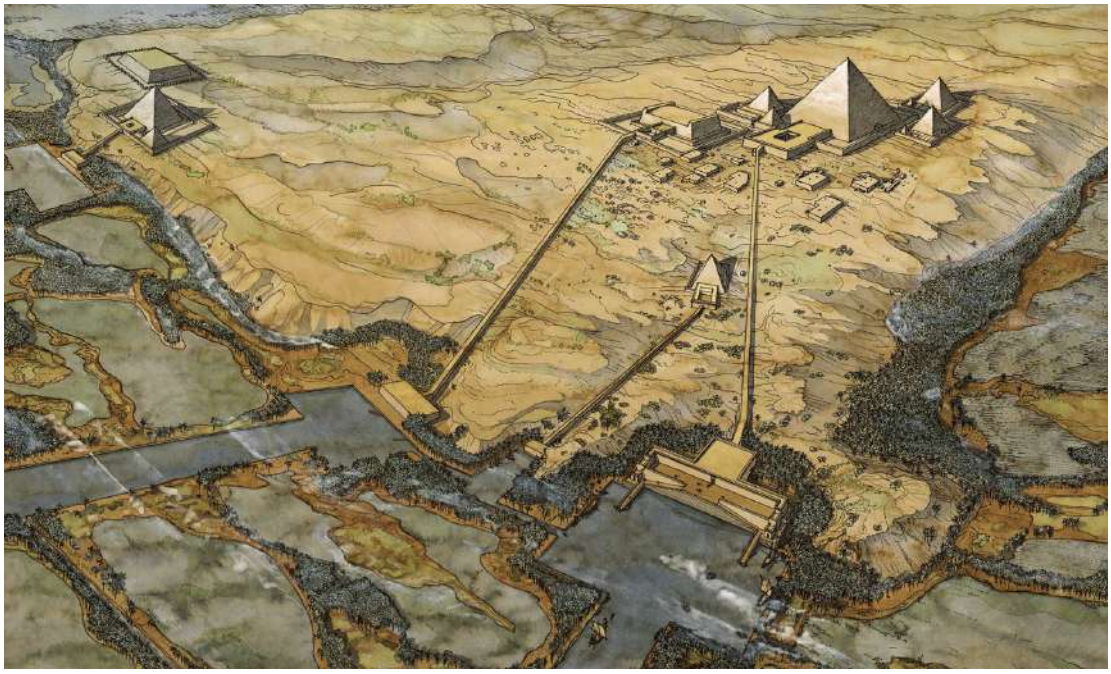

একটা সময়ে গিজার পিরামিডগুলোসহ কেমন দেখা যেতো সেটার কাল্পনিক চিত্র। কাল্পনিক চিত্রের সূত্র ও কপিরাইট: জ্যঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/karnak/)

মিসরীয় সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত নৌকা ও জাহাজের ছবি।

আবু সিম্বাল মন্দির

আবু সিম্বাল মন্দিরের মধ্যের একটি ছোট মন্দিরের দেয়ালচিত্র

বিখ্যাত রাজাদের উপত্যকা অথবা ভ্যালি অব কিংস-এর সেই সময়ের চেহারা কেমন ছিল? শিল্পীর কল্পনায়।
সূত্র ও কপিরাইট: https://www.deviantart.com/ecystudio/art/The-valley-of-the kings-৪৫৪৯৮৬৫৩৪

যদি আমি কখনো মিসর ভ্রমণে যাই:

তোমরা কি কেউ কখনো মিশরে গিয়েছ? কী কী দেখেছ আর কী কী তোমার ভালো লেগেছে এবং কেন তা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা কর।

যদি ভবিষ্যতে তোমার কখনো মিসর ভ্রমণের সুযোগ হয়, তাহলে তুমি কোন কোন জায়গায় যেতে চাও? কী কী স্থান পরিদর্শন করতে চাও? কী কী নিদর্শন দেখতে চাও? একটি ইচ্ছার তালিকা তৈরি করে ফেলো তাহলে:

আমি যে শহরগুলোতে যেতে চাই	আমি যে বিশেষ স্থানগুলো পরিদর্শন করতে চাই	আমি যে নিদর্শনগুলো দেখতে চাই	আমি যে কাজ গুলো করতে চাই
থিবস	সিম্বাল মন্দির	মমি	নীল নদে নৌকা বা জাহাজে ভ্রমণ
কারণ :	কারণ :	কারণ : এটি তৈরির প্রক্রিয়াটি আমার কাছে চমকপ্রদ লেগেছে।	কারণ :

তোমার ইচ্ছাগুলো পাশের বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে পারো।

মেসোপটেমীয় সভ্যতা: কয়েকটি সভ্যতার যোগফল

'মেসোপোটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ 'দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি'। মধ্যপ্রাচ্যের টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে পৃথিবীর কয়েকটি অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, এসেরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতার সমন্বয়ে বৃহৎ ভৌগোলিক সীমারেখাকে একই নামে চিহ্নিত করতে গিয়ে সভ্যতাটির নাম দেওয়া হয়েছে মেসোপটেমীয় সভ্যতা। তবে এখন মনে করা হয়, দুই নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকাই কেবল নয়, আরও বড় একটা অঞ্চলজুড়ে একের পর এক সাম্রাজ্য ও নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল বর্তমান ইরাক, কুয়েতসহ দেশগুলোতে এই সভ্যতা বা নগর-রাষ্ট্রগুলোর মিল ছিল তাদের লেখার রীতিতে আর ধর্মীয় মতবাদে, বিশেষ করে দেবতা ও দেবীদের উপরে অংশীদারত্বে। তাই মেসোপটেমীয় সভ্যতাকে কয়েকটি সভ্যতার মিলনও বলা যেতে পারে।

বিভিন্ন সময়ে একেকটি নগর একেকটি রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করতো। নগরের প্রধান বা শাসকই ওই রাষ্ট্রেরও প্রধান ছিলেন। প্রতিটি নগরের কেন্দ্রে ছিল একটি মন্দির। একেকটি নগরের প্রধান দেবতার প্রতি নিবেদিত এই মন্দিরগুলোকে বলা হতো জিগুরাত। এই মন্দিরকে ঘিরেই পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট, দুর্গ, সাধারণ মানুষের বসবাসের স্থাপনাসহ আরও নানা ধরনের স্থাপত্য নির্মিত হতো। মেসোপটেমীয় সভ্যতার নগর-রাষ্ট্রগুলোতে ইতিহাসে ঘটা প্রথমবারের মতো ঘটনা ঘটেছিল। যেমন: প্রথম লিখিত আইনি দণ্ডবিধি, প্রথম আইন প্রণয়নকারী সভা ছিল, নারীদের প্রথম সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল বিবাহ বিচ্ছেদের, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ও ব্যবসায়িক চুক্তি করার, প্রথম চিকিৎসা বিধি রচিত হয়েছিল, প্রথম কৃষিকাজের বিবরণী, প্রথম সাহিত্যিক বিতর্ক, প্রথম পেশাগত চাকরির ধারণা ইত্যাদি।

এশিয়া মহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা মেসোপোটেমীয় সভ্যতা, আধুনিক ইরাক, ইরান, কুয়েত, তুরস্ক, সিরিয়া জুড়ে এই সভ্যতাগুলোর নগর ও বসতিগুলো গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতাগুলো উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভূমিতে; যে ভূখণ্ডের উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল, দক্ষিণ ও পশ্চিমে আরব মরুভূমি এবং পূর্বে জাগরাস পার্বত্যাঞ্চল রয়েছে।

পার্বত্যাঞ্চল হলো পার্বত্য এলাকা। বৈশিষ্ট্যগতভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যথেষ্ট উচ্চতাসম্পন্ন, বন্ধুর এবং অতি স্বল্প পরিমাণের সমতল অথবা নিম্ন ঢাল বিশিষ্ট হয়ে থাকে। স্থানীয় বন্ধুরতা প্রায় ৬৫০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে, বিশ্বের প্রায় এক শতাংশ এলাকা নিম্ন ঢাল বিশিষ্ট পার্বত্য অঞ্চল এবং প্রায় ২৭ শতাংশ এলাকা পর্বতময়।

এখানে যে লেখার রীতির প্রচলন ঘটেছিল সেই রীতি কিউনিফর্ম নামে পরিচিত। পাথরে, পোড়ামাটির খণ্ডে এসব লেখার প্রমাণ বিভিন্ন নগরগুলো খনন করে পাওয়া গেছে। এই লিখনশৈলীতে কবিতা ও মহাকাব্য (যেমন: গিলগামেশের মহাকাব্য) লিখিত হয়েছিল। অন্যান্য সমসাময়িক সভ্যতার মতনই এই সভ্যতা বিকশিত হওয়ারও প্রধান ভিত্তি ছিল দজলা ও ফোরাত নদীর উর্বর অববাহিকায় কৃষিকাজের বিকাশ এবং উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন। পাশাপাশি, সমুদ্রপথে মিসরীয় সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র আর হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গেও এই সভ্যতাগুলোর কেন্দ্রগুলোর স্থল ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

বিভিন্ন সভ্যতার সময়কাল

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অধীনে মেসোপোটেমিয়ার অঞ্চলে বিভিন্ন সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। সেই সভ্যতাগুলোর নাম, সময়কাল আর প্রধান নগর-রাষ্ট্রের নামে নিচের সারণিতে পাবে:

সময়কাল	জাতিগোষ্ঠী	আবাসস্থল	প্রধান নগর
খ্রি. পূ.৩২০০-খ্রি. পূ.২৩২০	সুমের	উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এলামের পর্বতমালা	উর
খ্রি পূ.২৩২০-খ্রি. পূ.২১৩০	আক্কাদীয়	সুমেরের উত্তরে আক্কাদ অঞ্চলে (সেমেটিক ভাষী যাযাবর গোষ্ঠী)	আক্কাদ
খ্রি. পূ.২১৩০-খ্রি. পূ.২০০০	সুমের	উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এলামের পর্বতমালা	উর
খ্রি. পূ.২০০০	ইলামাইট	পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমি	উর
খ্রি. পূ.১৮০০-খ্রি. পূ.১৬০০	অ্যামোরাইট (সেমেটিক ভাষী যাযাবর গোষ্ঠী)	আরব মরুভূমি	ব্যাবিলন
খ্রি. পূ.১৬০০-খ্রি. পূ.১৩০০	ক্যাসাইট ও হিট্রাইট	এশিয়া মাইনর ও আনাতোলিয়া	
খ্রি. পূ.১৩০০-খ্রি. পূ.৬১২	এসেরীয়	টাইগ্রিসের উচ্চ উপত্যকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র মালভূমি	আসুর ও নিনেভ
খ্রি. পূ.৬১২-খ্রি. পূ.৫৩৮	ক্যালডীয় (সেমেটিক ভাষী যাযাবর গোষ্ঠী)	দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল	আসুর ও নিনেভ

সুমেরীয় সভ্যতা

মেসোপোটেমীয় সভ্যতার অগ্রদূত ছিল সুমেরীয় জাতি। তাদের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল লাগাস, কিস, ইরিদু এবং উরুক। বিখ্যাত শাসক সারগন সুমেরের নগররাষ্ট্রগুলোকে একত্র করেন। পরবর্তীকালের অপর বিখ্যাত শাসক ছিলেন সম্রাট 'ডুঙি'; যিনি সর্বপ্রথম একটি বিধিবদ্ধ আইন সংকলন করেছিলেন।

সামাজিক শ্রেণি ও বিশ্বাস

সুমেরীয়দের সমাজের প্রথম স্তরে ছিল শাসক ও ধর্মযাজক, দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ নাগরিক এবং তৃতীয় স্তরে ক্রীতদাস সম্প্রদায়। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল নার্গাল। এ ছাড়া সূর্যদেবতা শামাশ, বৃষ্টি ও বায়ুর দেবতা এনলিল এবং নারী জাতির দেবী 'ইশতা' নামে পরিচিত ছিলেন।

সুমেরীয় সভ্যতার বিভিন্ন আবিষ্কার ও সৃষ্টি

প্রাক সাধারণ অব্দ ২০০০ এ সুমেরীয়রা 'গিলগামেশ' নামক মহাকাব্যটি রচনা করেন। ৩০০০ প্রাক সাধারণ অব্দে সর্বপ্রথম সুমেরীয়রা কিউনিফর্ম নামক লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিলেন। কাদামাটিতে চাপ দিয়ে চিত্রাঙ্কন করে মনোভাব প্রকাশ করা হতো। সুমেরীয়রাই প্রথম চাকাচালিত যানবাহনের প্রচলন করেন। তাদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি ছিল 'জিগগুরাত' নামের ধর্মমন্দির।

কীলকাকার লিখন পদ্ধতির নাম কিউনিফর্ম

কিউনিফর্ম লিপির রূপান্তর। তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে বিভিন্ন শব্দ বোঝানোর জন্য কীভাবে লেখা হতো। তোমরা নিজেরা এই হরফে কাদার উপরে একটা কাঠি দিয়ে লিখে সেটা শুকিয়ে নিতে পারো। বা পুড়িয়ে শক্ত করে নিতে পারো।

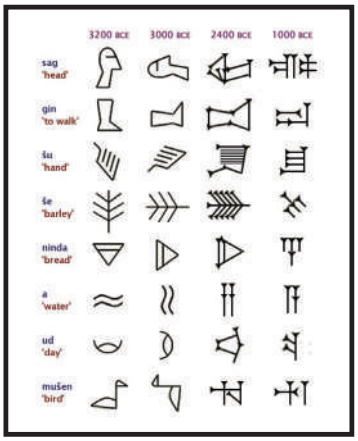

পূর্ণ বিকশিত কিউনিফর্ম লিপি (etsy.com)

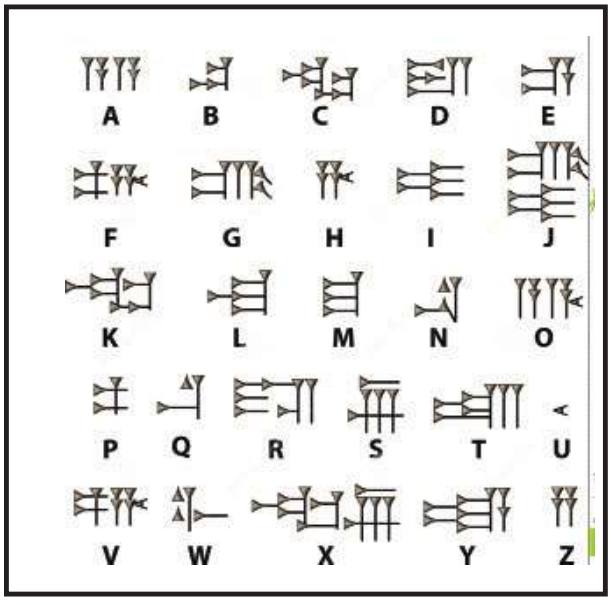

ইংরেজি বর্ণমালার অনুসারে কিউনিফর্ম লিপি

ব্যবিলনীয় সভ্যতা

ব্যবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল অ্যামোরাইট নামের সেমিটিক জাতি। ব্যবিলন এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী নগরে পরিণত হয়েছিল। সেমেটিক জাতির বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবি পৃথিবীর প্রথম আইনপ্রণেতা হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে ফ্রান্সের লুভ্যর জাদুঘরে সংরক্ষিত একটি স্তম্ভে ২৮২টি আইন উৎকীর্ণ করা আছে। ব্যবিলনীয় সভ্যতায় 'মারদুক' নামের সূর্যদেবতার পূজা অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া প্রণয়ের দেবী ইশতার, বায়ুর দেবতা মারুওসসহ অসংখ্য দেবদেবীর পূজা তারা করতেন। তারাই মাসকে ৩০ দিনে, সপ্তাহকে ৭ দিন ও দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করেন। বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত ও শিল্পকলায় যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

আসিরীয় সভ্যতা:

হাম্মুরাবির মৃত্যুর পর সেমেটিক জাতি আসুর ও নিনেভে বসবাস শুরু করার ফলে নগর দুটি প্রধান নগরে পরিণত হয়। এরাই সময়ের পরিক্রমায় এসেরীয় নামে পরিচিতি লাভ করে।

এসেরীয় সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা তৃতীয় তিগলাথপিলবার প্রথম প্রাদেশিক শাসন প্রবর্তন করেন। সেনাচেরির সময়ে সমগ্র উর্বর চন্দ্রাকৃতি ভূমি বিজিত হয় এবং তিনি নিনেভকে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেন। তবে মিসর অভিযানে তিনি ব্যর্থ হলেও তার পৌত্র আসুরবানিপাল মিসর দখল করেন। আসুরবানিপাল এশিয়ার প্রথম গ্রন্থাগারটি নিনেভে প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ২২০০০টির বেশি কাদামাটির চাকতির পুস্তক ছিল।

ক্যালডীয় সভ্যতা :

প্রাক সাধারণ অব্দ ৬১২ অব্দে এসেরীয়দের পতন ঘটলে নেবোপালসারের নেতৃত্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ও সভ্যতা গড়ে ওঠে, যেটি ক্যালডীয় বা নব্য ব্যাবলনীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। হাম্মুরাবির পর নিকট প্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন নেবোপালসারের পুত্র নেবুচাদনেজার। ব্যাবিলন শহরে ১০০ ফুট উঁচু ৫৬ মাইল দেয়াল এবং শহরের মধ্যবর্তী স্থানে দেবী ইশতারের স্মরণে ইশতার তোরণ ও সঙ্গে মিছিল সড়ক নির্মিত হয়েছিল। দেবতা মারদুকের নামে উৎসর্গকৃত জিগগুরাত মন্দিরটি তার উচ্চতার কারণে 'টাওয়ার অব ব্যাবেল' নামে পরিচিত। নেবুচাদনেজার তার রানীর সন্তুষ্টির জন্য নগর দেয়ালের উপর 'ঝুলন্ত উদ্যান' নামে অভিহিত একটি উদ্যান নির্মাণ করেন। এই অপূর্ব কীর্তি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য নামে খ্যাত।

পৃথিবীর ইতিহাসের মেসোপোটেমিয়া সভ্যতার পরবর্তী প্রায় সকল সভ্যতাই শিক্ষা, সাহিত্য চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। তাই বিশ্বসভ্যতায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

সভ্যতাগুলোর সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা

লিখিত বিভিন্ন সূত্র থাকায় এখানকার রাষ্ট্র, সমাজ, মানুষজন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। অনেক সময় নগরগুলো সার্বভৌম ছিল। লিখিত আইন ও দণ্ডবিধি প্রণীত হতো প্রধান শাসক ও প্রধান মন্দিরের পুরোহিতসহ বিভিন্ন মানুষের একটি সমষ্টির মাধ্যমে। আইনের ক্ষেত্রে সাবালক ও নাবালকের ভেদ ছিল। তবে রাজার ভূমিকাই মুখ্য ছিল। বিভিন্ন ধরনের পেশায় নাগরিকগণ যুক্ত ছিলেন। সমাজে উচ্চনীচ ভেদাভেদ আর নানা ধরনের পেশার মানুষজনের উপস্থিতির কারণে ভেদাভেদ ও বৈষম্য অন্যান্য সভ্যতার নগর ও বসতির মানুষজনের মতনই ছিল। প্রথম দিকে পুরোহিতগণের প্রাধান্য শাসনের ক্ষেত্রে থাকলেও পরে রাজা বা প্রধান শাসক সবচেয়ে ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন। মেসোপটেমীয়াতেই প্রথম রথ বা ঘোড়া চালিত চাকার বাহনের প্রমাণ

মেলে। কৃষিকাজ ও আবাদ করা প্রধান পেশা হলেও কারিগর, পুরোহিত, শিক্ষক, চিকিৎসক, চর্মকার ইত্যাদি পেশা ছিল।

নিচের ডায়াগ্রামটি ব্যবহার করে গ্রীক মেসোপটেমীয় সভ্যতার মূল সাতটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করি:

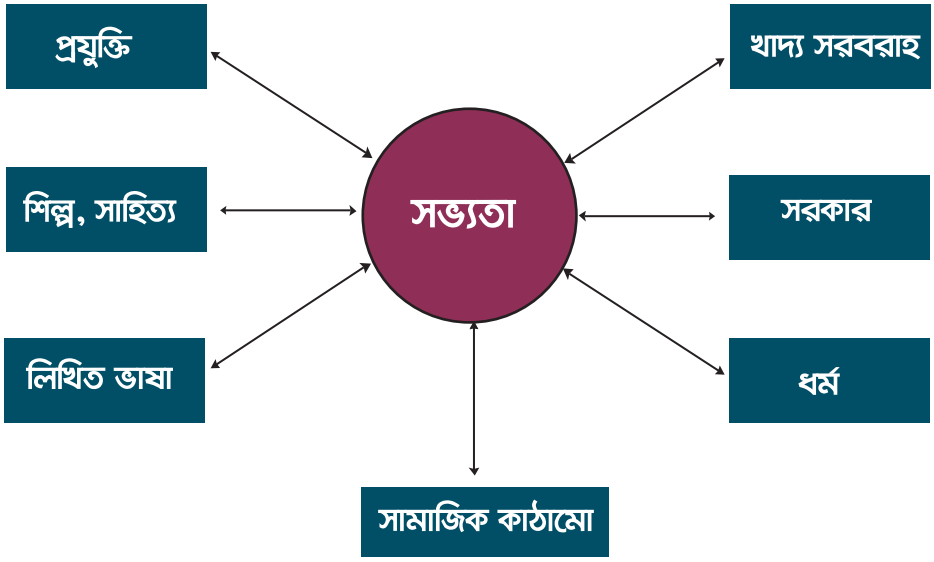

বিতর্ক: "মিসরীয় সভতা মেসোপোটেমীয় সভ্যতার চেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিল"
দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরি। বন্ধুরা আর খুশি আপা হবেন বিচারক।
এর পক্ষে আর বিপক্ষে যুক্তি গুলো পয়েন্ট আকারে লিখে রাখিঃ

পক্ষে যুক্তি	বিপক্ষে যুক্তি

গুরুত্বপূর্ণ ও মজার তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তৈরি:

মেসোপোটেমিয়া সভ্যতার কত গুরুত্বপূর্ণ আর মজার মজার বিষয় আমরা পড়লাম। এবারে আমরা এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতার প্রতিটির জন্য পাঁচটি করে প্রশ্ন তৈরি করি, যে প্রশ্নের উত্তর এক শব্দে বা এক কথায় দেওয়া যায়। উত্তরগুলোও চিহ্নিত করি আর লিখে রাখি। তোমার পাশের বন্ধুও নিশ্চয়ই এ রকম কিছু প্রশ্ন তৈরি করেছে। দুজন দুইজনের তৈরি করা প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি। দেখি তা কে কয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারি। ভুল হলে বই দেখে নেই বন্ধুর সঙ্গে মিলে।

সুমেরীয় সভ্যতা	কোন শাসক সুমেরীয় নগর রাষ্ট্রগুলোকে একত্রি করেন? উত্তর: সারগম সুমেরের সারগন সুমেরর বিভিন্ন নগরকেন্দ্রগুলোকে একত্র করেন।
ব্যাবলনীয় সভ্যতা	
আসিরীয় সভ্যতা	
ক্যালডীয় সভ্যতা	

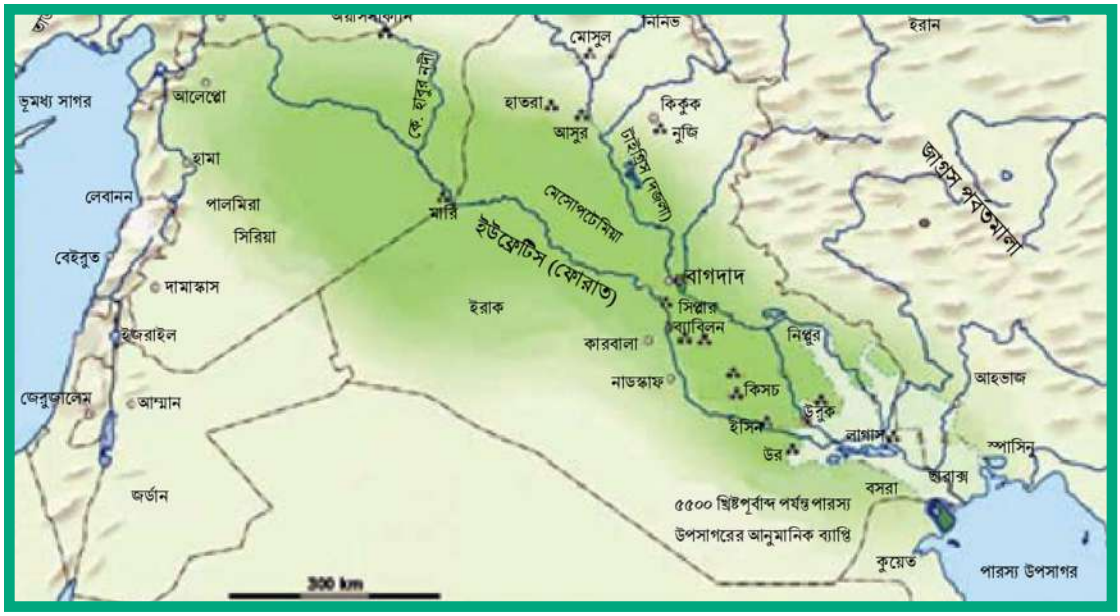

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা ও ফোরাত) নদী বিধৌত উর্বর অববাহিকায় একের পরে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই সভ্যতাগুলো মিলেই মেসোপটেমীয় সভ্যতা। মানচিত্রটিতে মেসোপটেমীয় সভ্যতায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্রের অবস্থানও দেখানো হয়েছে। (https://www.ancient-civilizations.com/mesopotamian-civilization/)

মেসোপটেমীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্র ও বিস্তৃতি (সূত্র ও কপিরাইট: https://kmjantz.wordpress.com/২০১৩/০৪/২৫/early-civilizations/)

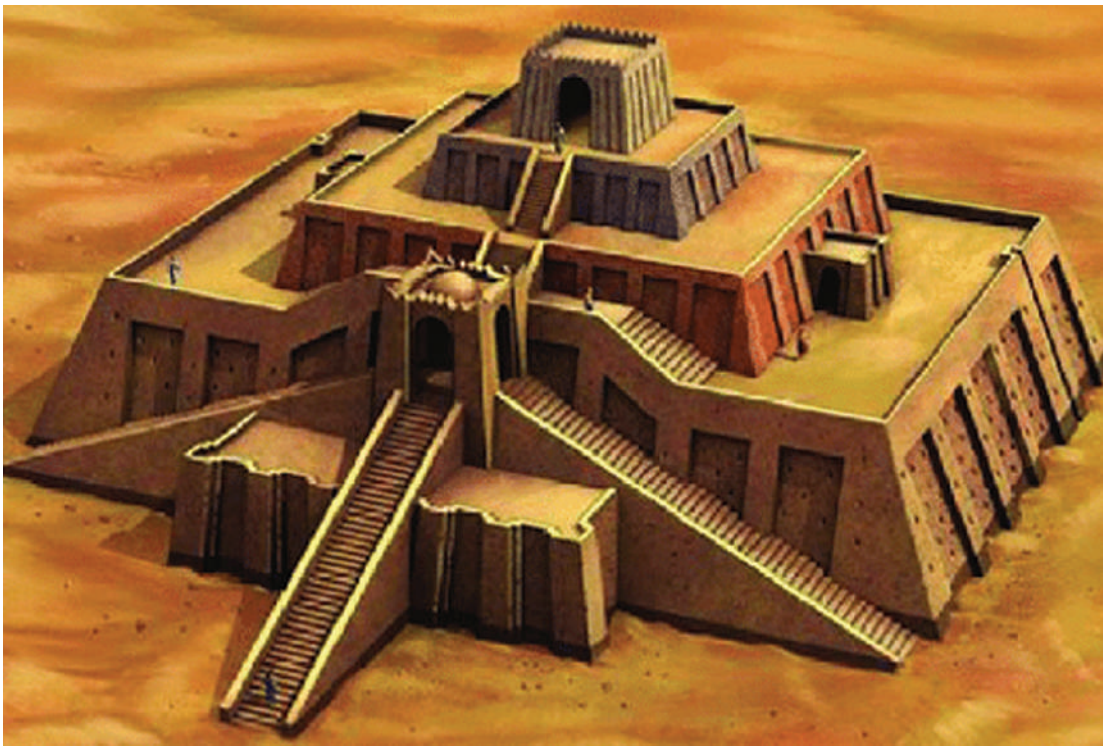

সুমেরীয়দের প্রতিটি নগরকেন্দ্রে একটি নগরদেবতার নামে উৎসর্গ করা মন্দির ছিল। এই মন্দিরগুলোকে জিগুরাত বলা হতো। উর নগরের জিগুরাতটি তখন দেখতে কেমন ছিল? সেই মন্দিরের দুটো কাল্পনিক ছবি। কপিরাইট : জ্যঁ ক্লদ গোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/project/middle-east/

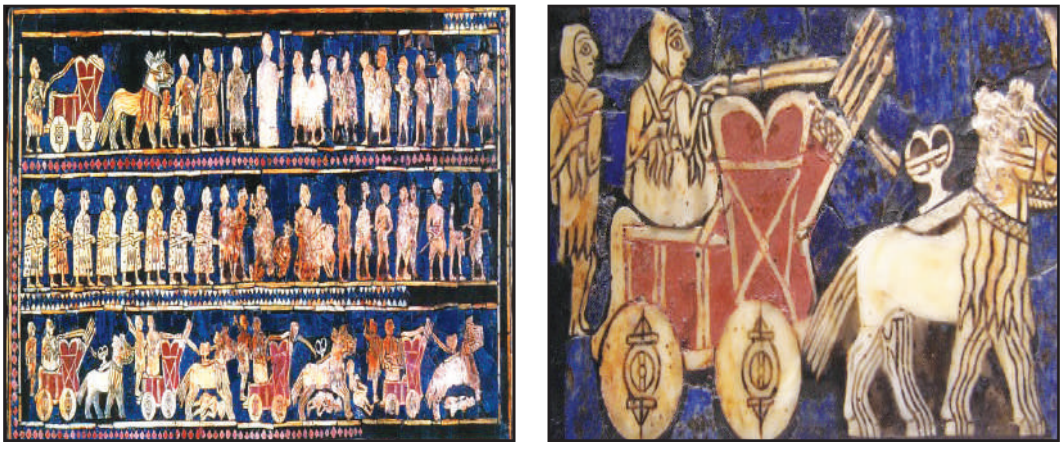

উর থেকে প্রাপ্ত চিত্রে অঙ্কিত যানবাহনে চাকার ব্যবহার
For Video https://www.khanacademy.org/humanities/history/ancient-medieval/Ancient/v/standard-of-ur-c-২৬০০-২৪০০-b-c-e

সুমেরীয় সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত কাদামাটির ট্যাবলেটে বার্লি ও গমের উল্লেখ পাওয়া যায়

আক্কাদীয় রাজা সারগন (বামে); নব্য-আসিরীয় রাজা দ্বিতীয় শালমানাসেরের (ডানে) প্রতিকৃতি।

এই পাথরে খোদিতলিপি ও ভাস্কর্যটি পৃথিবীর প্রথমদিকের দণ্ডবিধিগুলোর (অপরাধের শাস্তির আইন) মধ্যে একটি। ব্যাবিলনীয় রাজবংশের রাজা হাম্বুরাবি (আনু. প্রাক সাধারণ ১৭৯২ অব্দ থেকে ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন) এই দণ্ডবিধিটি জারি করেন। উপরের ভাস্কর্যটিতে হাম্বুরাবি দাঁড়ানো অবস্থায় ন্যায়বিচারের দেবতা শামাশ (বা মারডুকের) কাছ থেকে রাজকীয় প্রতীক গ্রহণ করছেন। নিচে আইনের প্রতিটি বিধি লিখিত রয়েছে কিউনিফরম হরফে। বিভিন্ন অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির কথা এখানে লেখা রয়েছে।

রাজা আসুরবানিপালের সিংহ শিকারের দৃশ্য

এখন ব্যাবিলন নগরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। খনন করে ব্যবিলন নগরের ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্থাপনাগুলোর কিছু কিছু খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদগণ মিলে অনুমান করার চেষ্টা করেছেন সেই নগরটি দেখতে কেমন ছিল। (uruk-uarka.dk)

ব্যবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানকে প্রাচীন পৃথিবীর সাতটি বিস্ময়ের একটি হিসেবে বিভিন্ন লিখিত উৎসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই উদ্যানের কোনো বস্তুগত প্রমাণ ব্যাবিলন নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া যায় নি। অনেকেই মনে করেন, সমকালীন আরেকটি নগর নিনেভে রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যে উদ্যানের কথা দেয়াল চিত্রে পাওয়া যায়, সেই উদ্যানই পরে জনমুখে ব্যাবিলনে অবস্থিত বলে ভুল করা হয়েছে। শিল্পীর কল্পনায় এই উদ্যান বা বাগান এমন ধাপে (uruk-uarka.dk)

ব্যাবিল নগরে প্রবেশ করার প্রধান তোরণ। এই তোরণ ইশতার গেইট বা ইশতার তোরণ নামেও পরিচিত। বিভিন্ন বিশ্লেষণের পরে শিল্পীগণ কল্পনা করে এই চিত্র এঁকেছেন। (uruk-uarka.dk)

আরেকটি নগর-রাষ্ট্র নিনেভের একটি দিকের কাল্পনিক চিত্র। দেখা যাচ্ছে নগরের জিগুরাত, রাজা আসুরবানিপলের প্রাসাদ আর রাজার তৈরি করা পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থাগার।

মেসোপটেমীয়দের চোখে পৃথিবীর ম্যাপ ও বর্ণনা এই কাদার ট্যাবলেটে খোদাই করা। (uruk-uarka.dk)

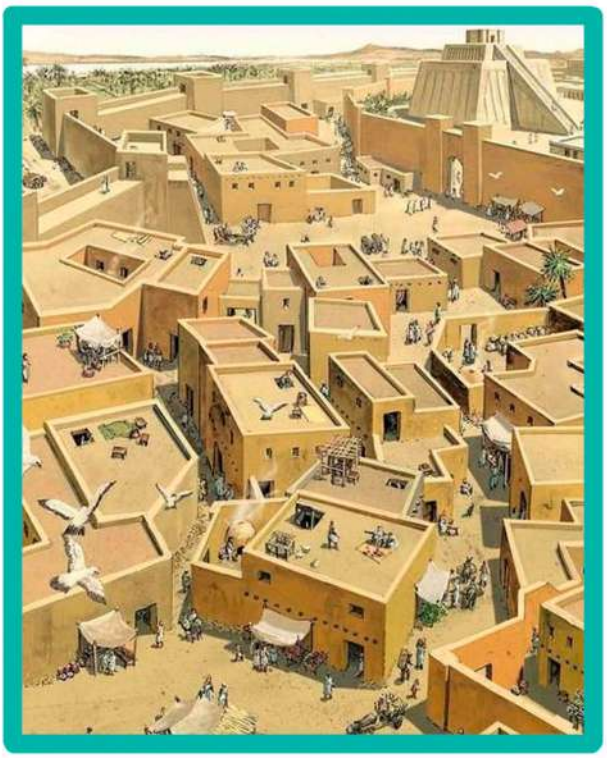

উর নগরের সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি এমনই ছিল বলে ধারণা করেছেন ইতিহাসবিদগণ। এখন ছড়িয়ে আছে একসময়ের বিরাট উর নগরের ধবংসাবশেষ।

মেসোপটেমিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নগর-রাষ্ট্র উর দেখতে এমন ছিল। ইতিহাসবিদগণ পুনর্গঠন করেছেন বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে।

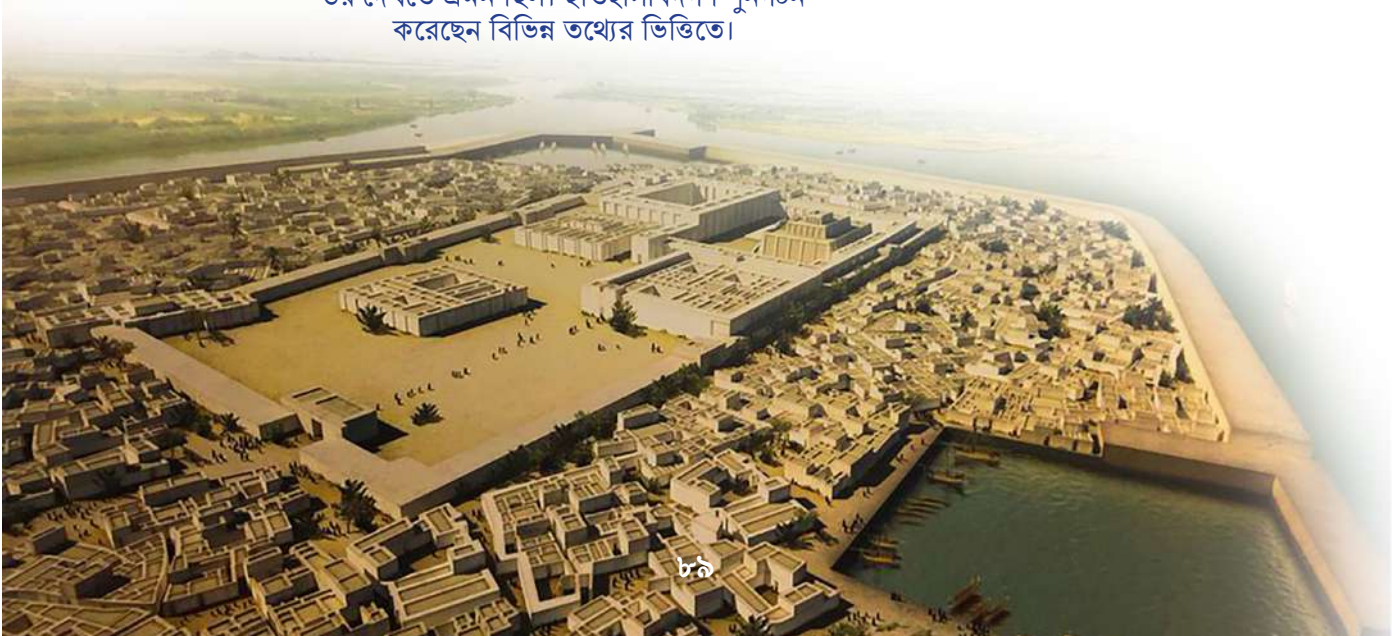

উরুক নামের আরেকটি নগর-রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে নগরের বসতির একটি অংশের পুনর্নির্মাণ করেছেন ইতিহাসবিদ ও কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা মিলে। সূত্র ও কপিরাইট: https://www.researchgate.net/publication/২৮০১৩৪৪৯১_City_of_Uruk_৩০০০_BC_Using_genetic_algorithms_dynamic_planning_and_crowd_simulation_to_re-enact_everyday_life_of_ancient_Sumerians_-_Best_Poster_Award

মেসোপটেমীয় সমুদ্রগামী একধরনের নৌকা।

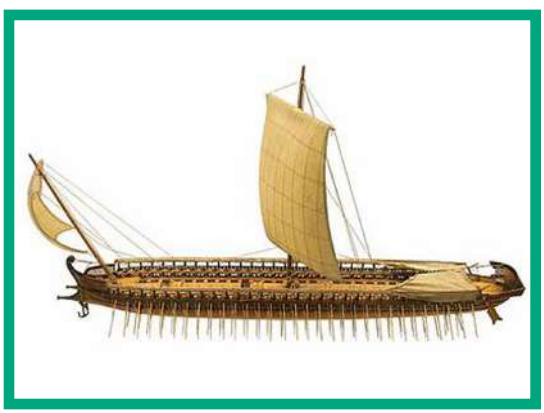

মেসোপটেমীয় সমুদ্রগামী নৌকা বা জাহাজের আরেকটি ধরন।

গ্রিক সভ্যতা: সমুদ্রনির্ভর বিভিন্ন নগররাষ্ট্র

গ্রিসের মহাকবি হোমার রচিত 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যের উল্লিখিত চমকপ্রদ কাহিনির সূত্র ধরে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ট্রয় নগরীসহ ১০০ নগরীর ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পান। ক্রিট দ্বীপের মিনীয় ও গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণ অঞ্চলের মাইসেনীয় সভ্যতা; এ দুটি সভ্যতাকে একত্রে ইজিয়ান সভ্যতা বলা হয়। এই ইজিয়ান সভ্যতার উন্নয়নের ফল হিসেবে গ্রিস সভ্যতার বিকাশ ঘটে। যে কারণে ইজিয়ান সভ্যতার অপর নাম প্রাক্-ক্লাসিক্যাল বা আদি গ্রিক সভ্যতা গ্রিকসভ্যতা। অন্যান্য সকল সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক হলেও গ্রিক সভ্যতায় সাগরের অবদান লক্ষ করা যায়।

প্রাচীন গ্রিসের প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো পর্বত, সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপমালা।

মূলত গ্রিস সভ্যতা ছিল অনেকগুলো দ্বীপরাষ্ট্রের সমন্বয়। এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সময়

পর্বত

পর্বত বলতে আমরা ভূপৃষ্ঠের এমন একটি অবস্থানকে বুঝি যার উচ্চতা অধিক এবং যা খাড়া ঢালবিশিষ্ট। সাধারণত ১০০০ মিটারের অধিক উচ্চতার বিশিষ্ট ভূমিরূপগুলোকে পর্বত বলে। পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার মিটার হতে পারে। যেমন কিলিমানজারো ও হিমালয় পর্বতমালা।

কীভাবে পর্বতমালা গঠিত হয়?

কিছু পর্বত আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ দ্বারা গঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরির পর্বতগুলো পৃথিবীর গভীরে গলে যাওয়া শিলা দিয়ে তৈরি। পাথরটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ বা ভূত্বকের মধ্য দিয়ে উঠেছিল। তারপর এটি লাভা আকারে পৃষ্ঠের উপর প্রবাহিত হয়। লাভা ও আগ্নেয়গিরির ধূলিকণা মিলে পর্বত গঠিত হয়। আগ্নেয়গিরির পর্বতগুলো সাধারণত খাড়া এবং মোচার মতো আকৃতির হয়। জাপানের মাউন্ট ফুজি, আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট রেইনিয়র আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ।

অন্য পর্বতগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠ বা ভূত্বকের মধ্যে চলাচলের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। প্লেট টেকটোনিক্স নামে একটি তত্ত্ব আছে যা বিশদভাবে তোমরা পরের শ্রেণিতে জানবে , এই তত্ত্ব এই ধরনের পর্বতে গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। সংক্ষেপে যদি বলা হয়, তাহলে পৃথিবীর পৃষ্ঠটি অনেকগুলো প্লেট নামক বিশাল অংশে বিভক্ত, যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা গলিত শিলার উপরে ভেসে থাকে এবং খুব ধীরে ধীরে চলে। মহাদেশগুলো প্লেটের উপরের অংশে থাকে এবং সেগুলোর সঙ্গে চলে। অনেক সময় প্লেটগুলোর সংঘর্ষ হয়, তখন ভূপৃষ্ঠ উপরের দিকে উঠে যায়, আর এই উঁচু হয়ে যাওয়া অংশকে আমরা বলি পর্বত। এশিয়ার হিমালয় এই ধরনের পর্বতের উদাহরণ। ভারত বহনকারী একটি প্লেট এর সঙ্গে এশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে এগুলো তৈরি হয়েছিল।

সংঘাতে যেমন লিপ্ত হয়েছে, তেমনি আবার সংঘবদ্ধ হয়েও নানা কাজ করেছে। যে কারণে এ সভ্যতায় ছোট ছোট নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। গ্রিসের তিন দিক অ্যাড্রিয়াটিক, ভূমধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে নদীগুলো খালের মতো অপ্রশস্ত, অগভীর ও অনাব্য, যে জন্য এখানকার ভূমি উর্বর ছিল না। এ কারণে গ্রিসে গড়ে ওঠা সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক না হয়ে সাগরকেন্দ্রিক সভ্যতা হিসেবে বিকশিত হয়েছে।

আনুমানিক ১৩০০ থেকে ১২০০ প্রাক সাধারণ অব্দ থেকে সূচিত হয়ে প্রাক সাধারণ অব্দ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে গ্রিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। পর্বতময় গ্রিস দ্বীপরাষ্ট্রের প্রধান শহর ছিল এথেন্স। সেখানেই প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিসের ছোট নগর রাষ্ট্রগুলোকে বলা হতো পলিস। পেলোপনেসাসের স্পার্টা নগররাষ্ট্রটি সমরতন্ত্র দ্বারা বা যুদ্ধকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেবার নীতি প্রভাবিত ছিল। গ্রিক নগররাষ্ট্রের দুর্গ সুরক্ষিত অঞ্চলকে বলা হতো অ্যাক্রোপলিস। আর কর্মচঞ্চল এলাকাকে বলা হতো অ্যাগোরা।

সামাজিক অবস্থা

গ্রিক সমাজ ছিল শ্রেণি বিভক্ত। সমাজের উচ্চতর স্তরে ছিল অভিজাত শ্রেণি এবং অপর শোষিত ও নির্যাতিত শ্রেণি ছিল দাস ও শ্রমিকগণ। অভিজাতগণ ছিল অগাধ সম্পত্তির মালিক ও প্রশাসনের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা ছিল সবচেয়ে সুবিধাবাদী। গ্রিক সমাজে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল বণিক গোষ্ঠী।। হেলেনিস্টিক যুগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ হলেও তা কেবল শাসক ও বণিকসহ অভিজাত শ্রেণি ভোগ করেছে। অপর দিকে কায়িক শ্রমের কাজগুলো করেছে ক্রীতদাসেরা।

প্রাচীন গ্রিকদের ঘরবাড়ি কেমন ছিল?

গ্রিকদের ঘরবাড়িগুলো একটি বড় উঠানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল। এই উঠানই ছিল তাদের নানান কার্যা কলাপের কেন্দ্রবিন্দু। সাধারণত উঠানে জল সরবরাহের একটি কূপ, দেবতাদের উপাসনা করার জন্য একটি বেদি, বাচ্চাদের খেলাধুলার উপযোগী একটি জায়গা ছিল। উঠানের চারপাশে থাকা ঘরগুলো ছিল কাজের ঘর, স্টোররুম, শয়নকক্ষ ইত্যাদি। অধিকাংশ বাড়িতে 'অ্যান্ড্রন' নামে একটি ঘর ছিল, যেখানে বাড়ির পুরুষেরা আড্ডা দিতো এবং তাদের বন্ধু ও ব্যবসায়িক সহযোগীদের সময় দিতো।

কৃষি ও বাণিজ্য

কৃষি ও বাণিজ্য ছিল গ্রিক অর্থনীতির মূলভিত্তি। অধিকাংশ ভূমি পার্বত্যময় ও অনুর্বর হওয়ায় খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। সাধারণভাবে কৃষক ছিলেন দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত। গম ও যব ছিল প্রধান কৃষিপণ্য। গ্রিসের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল অভিজাত ও বণিকদের হাতে।

ধর্মীয় বিশ্বাস

প্রাচীন গ্রিকরা ছিলেন মূলত প্রকৃতি পূজারি ও বিভিন্ন দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। গ্রিসবাসীদের প্রধান দেবতা ছিলেন জিউস। তবে তাদের প্রতিটি নগর ও অঞ্চলের নিজস্ব দেবতা ছিল। জিউস কখনো আকাশের দেবতা, আবার কখনো বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যুদ্ধের দেবতা ছিলেন আরাস। সূর্যদেবতা ছিলেন অ্যাপোলো, পসিডন ছিলেন সমুদ্রের দেবতা। জ্ঞান ও বায়ুর দেবী ছিলেন চিরকুমারী এথেনা।

স্থাপত্য

জ্ঞানের দেবী এথেনার উদ্দেশে হেলেনেস্টিক সময়ে বিখ্যাত পার্থেনন মন্দির নির্মিত হয়। গ্রিক সভ্যতায় হেলেনীয় যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। গ্রিসের সবচেয়ে খ্যাতিমান ভাস্কর ফিদিয়াসের ৭০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দেবী এথিনার মূর্তি ইতিহাসের দুর্লভ সংযোজন। এথেন্সের এক্রোপলিসে গ্রিক সভ্যতার সুন্দর নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ ও বড় বড় স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ যে কারও চিত্ত আকর্ষণ করে। ডোরীয়, আয়োনীয় ও কোরেন্থীয় রীতির স্তম্ভ বর্তমানেও অনুসরণ করা হয়।

দর্শন, খেলাধুলা ও সাহিত্য চর্চা

জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, খেলাধুলা, সাহিত্য চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রিকদের বিশাল অবদান রয়েছে। ইতিহাসের জনক খ্যাত হেরোডটাস গ্রিস ও পারস্যের যুদ্ধ নিয়ে ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রথম বই রচনা করেন। গ্রিক সভ্যতায় থেলেস, সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতো খ্যাতিমান দার্শনিক ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটেসেরও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ৭৭৬ প্রাক সাধারণ অব্দে সর্বপ্রথম গ্রিকদের দ্বারা অলিম্পিক গেমস খেলা শুরু হয়। আর তারাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করে। গ্রিক সভ্যতা শুধু ইউরোপকে নয় পুরো পৃথিবীকে আলোর পথে অগ্রসর করে দেয়।

সে সময়ের অন্যতম প্রধান নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের নগরের মূল কেন্দ্র বা অ্যাক্রোপলিসেরে বর্তমান আলোকচিত্র (Source: history৪kids.co)

এথেনিয়ান অ্যাক্রোপলিস: দেবী এথেনার পার্থেনন মন্দির (Source: history৪kids.co)

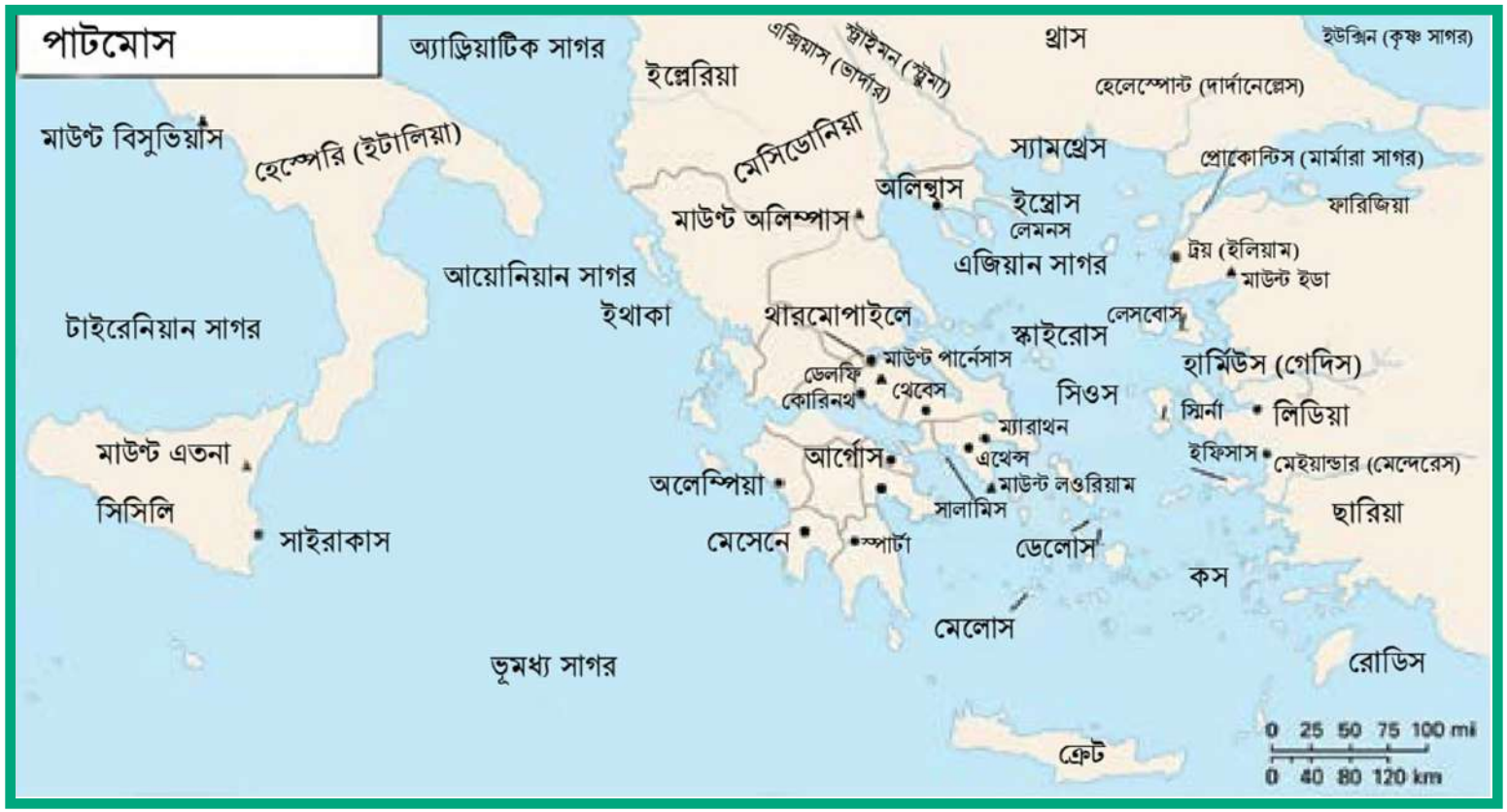

গ্রিক সভ্যতার নগর-রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান (Source: britanica.com)

পার্সিপোলিসের সেকালের কাল্পনিক চিত্র।

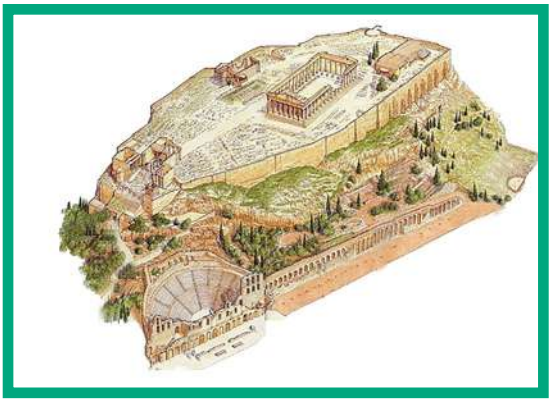

অ্যাক্রোপলিসের বিভিন্ন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ।

অলিম্পিয়া নগরীর সেই সময়ের কাল্পনিক চিত্র।

করিন্থ নগর-রাষ্ট্র সেইসময়ে কেমন ছিল? ইতিহাসবিদগণ তা পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন।

গ্রিস সভ্যতার আরেকটি নগর-রাষ্ট্র মাইসেনি সেই সময়ের চিত্র কল্পনা করা হয়েছে।

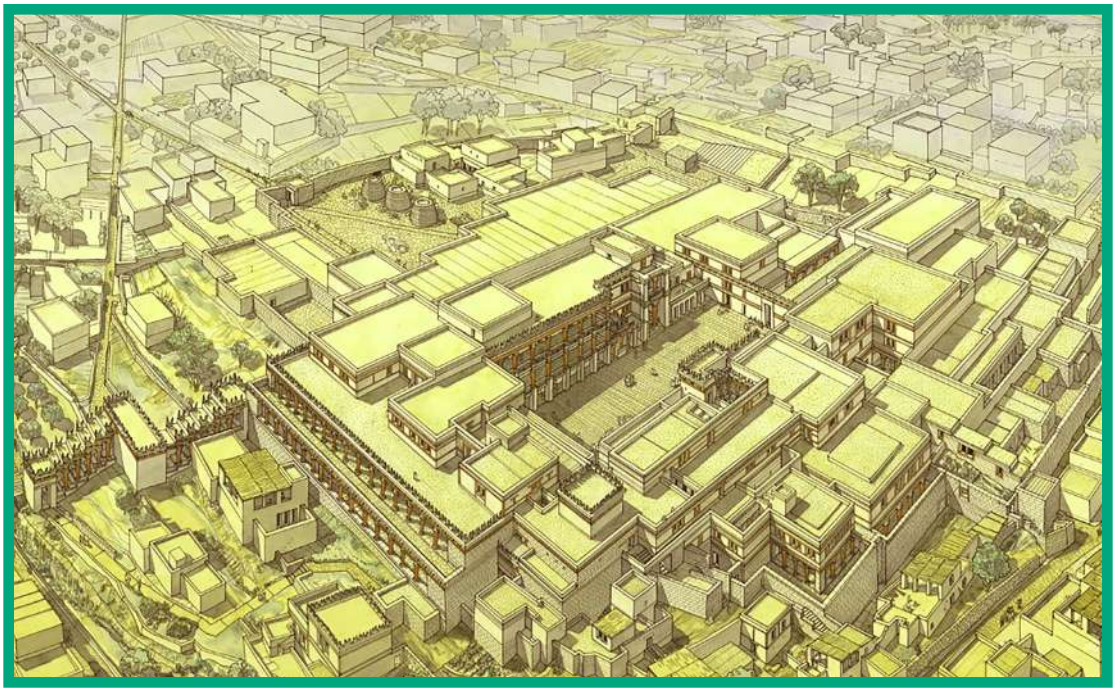

গ্রিস সভ্যতার আরেকটি নগর-রাষ্ট্র ক্রিটের সেই সময়ের চিত্র কল্পনা করা হয়েছে। সূত্র ও কপিরাইট: https://jeanclaudegolvin.com/en/

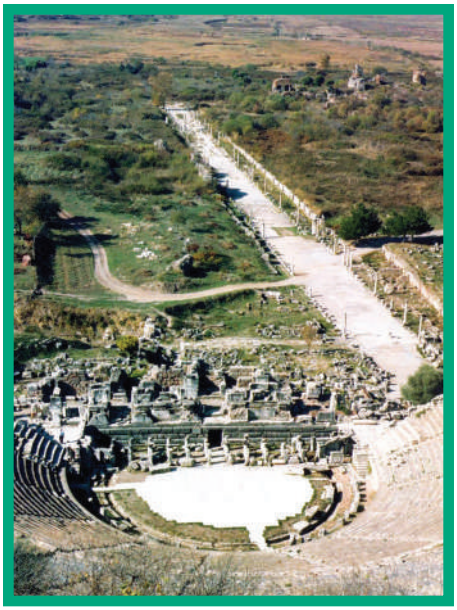

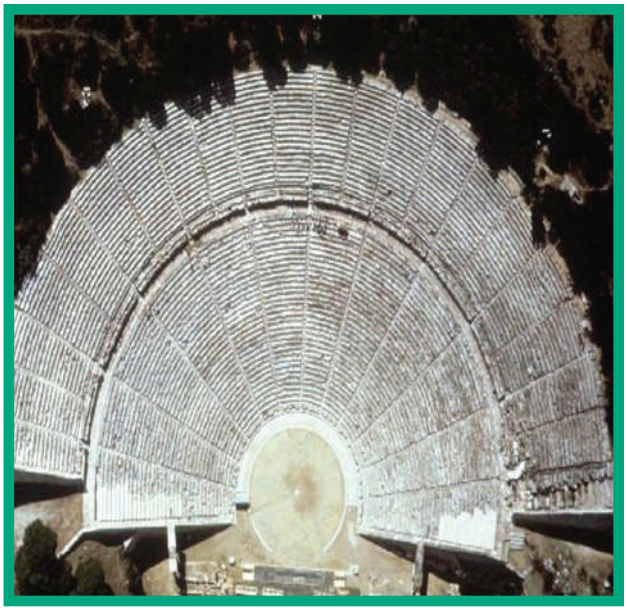

গ্রিক থিয়েটার (Source: worldhistory.org)

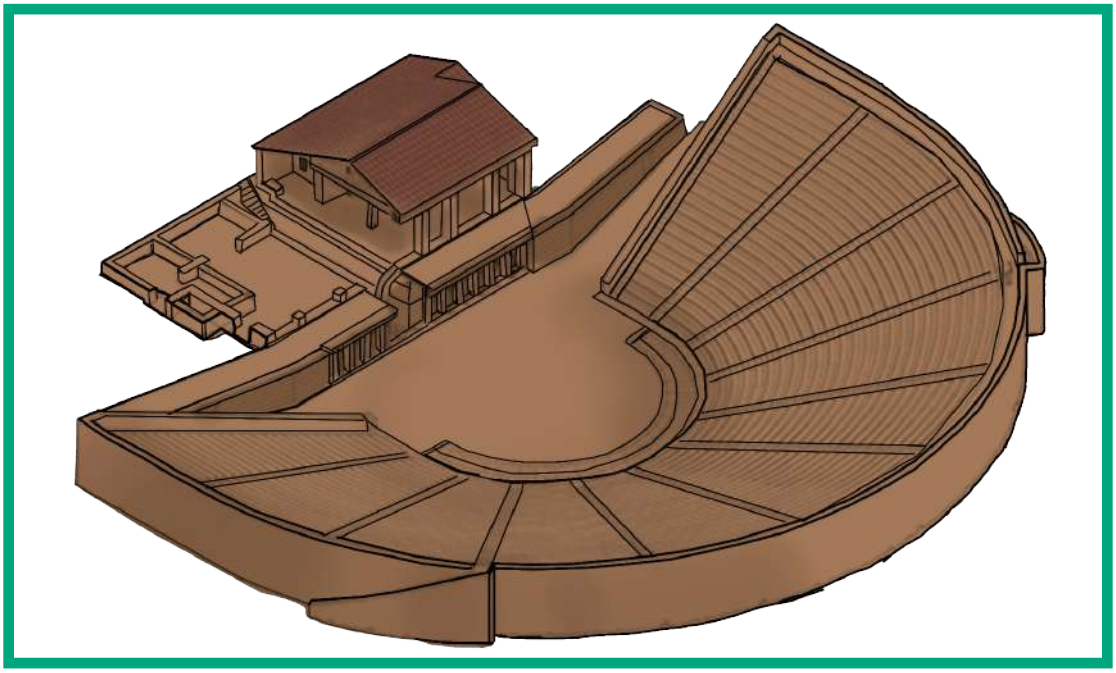

গ্রিক থিয়েটারের সেকশন ড্রয়িং (Source: theaterseatstore.com)

গ্রিসে বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি করা হতো। এসব মৃৎপাত্রের মধ্যে একধরনের মৃৎপাত্র খুব বিখ্যাত ছিল। সেগুলোকে অ্যাম্ফোরা বলা হতো। সাধারণত বিভিন্ন জিনিস ও তরল পদার্থ সংরক্ষণ করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হলেও, অভিজাত শ্রেণির মানুষজন অন্যান্য কাজেও এগুলো ব্যবহার করতেন। বহু অ্যাম্ফোরার উপরে বিভিন্ন চিত্র আঁকা থাকতো। এই চিত্রগুলো সেই সময়ের গ্রিসের জীবনযাপন ও সমাজ নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য দেয়। উপরের অ্যাম্ফোরার বাইরের দিকে একটি দৌড় প্রতিযোগিতার চিত্র আঁকা রয়েছে। এসব অ্যাম্ফোরা বাণিজ্যিক ভাবে বা কোনো জিনিস সংরক্ষণ করে সমুদ্রপথে দুরে রপ্তানী করা হতো। ভারত উপমহাদেশের অনেক স্থান থেকেও এমন অ্যাম্ফোরা বা খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে।

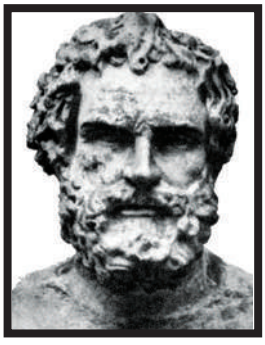

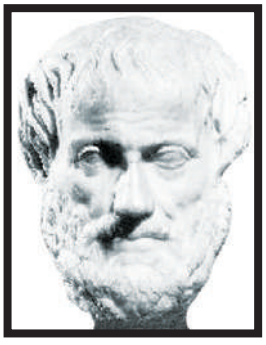

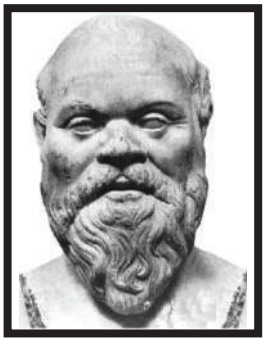

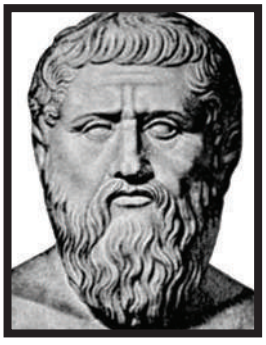

গ্রিসের সেই সময় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা হত বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে। অনেক গ্রিক চিন্তাবিদের প্রভাব আমাদের গণিত-দর্শন-বিজ্ঞান-জ্যোতির্বিজ্ঞান-চিকিৎসাবিজ্ঞানে পড়েছে। তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এমনই চারজন চিন্তাবিদের ভাস্কর্যের ছবি এখানে রয়েছে। বাম থেকে ডানে: থেলেস (প্রাক সাধারণ ৬২৩-৫৪৫ অব্দ); অ্যারিস্টটল (প্রাক সাধারণ ৩৮৪-৩২২ অব্দ); সক্রেটিস (প্রাক সাধারণ ৪৭০-৩৯৯ অব্দ); প্লেটো (প্রাক সাধারণ ৪২৭-৩৪৭ অব্দ)

গ্রিস সভ্যতায় প্রাচীন গ্রিসের দেবতা ও দেবীদের নিয়ে অনেক গল্প ও কাহিনি লেখা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন ধরনের চিত্র আঁকা হয়েছে। মহাকবি হোমার লিখিত ইলিয়াড ও অডিসি নামের মহাকাব্যে এই দেব-দেবীরা মানুষের সঙ্গে নানা ঘটনা ও যুদ্ধে সম্পর্কিত থাকেন। তোমরা বড় হয়ে ওই সময়ের গ্রিক দেবতা ও দেবীদের নিয়ে তৈরি করা অনেক সিনেমাও দেখতে পারবে। গ্রিকদের পুরাণকথা অনুসারে স্বর্গের অলিম্পাস পর্বতে বারোজন দেবতা ও দেবী থাকেন। তারা হলেন: আকাশ, বজ্রপাত, আইন ও বিচারের দেবতা ও দেবতাদের

জিউস

আর্টেমিস

অ্যাপোলো

ডায়োনিসা

হেরা

অ্যাথিনা

অ্যারিস

অ্যানিমেশন বা কার্টুনের চিত্রে যদি গ্রিক দেবতা ও দেবীদের দেখতে চাও তাহলে তাদের চেহারা এমন হবে।

স

হেডিস

আফ্রোদিতি

পসাইডন

রাজা জিউস; বিবাহ, নারী ও শিশুর জন্ম-পরিবারের দেবী হেরা; সমুদ্র, পানি, ঝড় ও ভূমিকম্পের দেবতা পসাইডন; উর্বরতা, কৃষিকাজ, প্রকৃতি ও ফসলের দেবী দিমিতার; জ্ঞান, হস্তশিল্প, যুদ্ধ ও বীরত্বের দেবী অ্যাথেনা; শিল্পকলা, দর্শন, সত্য, কবিতা ও চিকিৎসার দেবতা অ্যাপোলো; সুরক্ষা, শিকার, ধনুর্বিদ্যা ও প্লেগ মহামারীর দেবী আর্তেমিস; যুদ্ধ, সংহিসতা,ও রক্তপাতের দেবতা অ্যারিস; সৌন্দর্য্য, ভালোবাসা, আবেগ, সৃষ্টি ও আকাঙ্খার দেবী আফ্রোদিতি; কারিগরি, প্রকৌশল, আগুন ও আবিষ্কারের দেবতা হলেন হেফাস্টাস; বাণিজ্য, যোগাযোগ, কূটনীতি, খেলাধূলা ও ভ্রমনের দেবতা হার্মিস; স্বাস্থ্য, আগুন, ঘরের কাজ ও পরিবারের দেবী হলেন হেস্টিয়া; উর্বরতা, আনন্দ, বিনোদন ও পুনর্জন্মের দেবতা ডায়োনিসাস। এই বারোজন দেবতা ও দেবীর মধ্যে কয়েকজনের ভাস্কর্য তোমাদের জানার জন্য দেওয়া হলো।

গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসের কোনো কাহিনিই পুরোপুরি বোঝা যাবে না যদি সমুদ্রের সঙ্গে গ্রিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা না-জানি। দ্বীপরাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ আর যুদ্ধের জন্য গ্রিকরা নৌযুদ্ধের বিভিন্ন জাহাজ ও কৌশল আবিষ্কার করেছিল। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্যও তারা বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবহার করত। জাহাজ নির্মাণ ও চালনায় গ্রিকরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। জাহাজকে ট্রিয়েম বলা হতো। বিভিন্ন লিখিত সূত্রে জানা যায় যে, তারা বিভিন্ন জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিতো। বেশির ভাগ নামই দেবতা-দেবী, স্থান, প্রাণী, বস্তু বা ধারণার (যেমন: স্বাধীনতা, গৌরব, সাহস ইত্যাদি) নামে হতো। নিচে গ্রিকদের কয়েকটি ধরনের জাহাজের চিত্র তোমাদের দেখার জন্য দেওয়া হলো। এ ধরনের জাহাজ কি তোমরা কাগজ দিয়ে বানাতে পারবে? চারপাশের বিভিন্ন জিনিস দিয়েও তোমরা এমন জাহাজ বানানোর চেষ্টা করতে পারো?

নৌযুদ্ধ

যুদ্ধজাহাজের বহর

বড় জাহাজ ও ছোট নৌকার মিলিয়ে
যুদ্ধের জন্য তৈরি করা নৌবহর

মালবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ

সভ্যতা যেমন জীবন-প্রযুক্তি-স্থাপত্য-চিন্তায় বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে, তেমনই সভ্যতার শাসকগণ অন্য অঞ্চল দখল করতে চান। একটি রাজত্বের সঙ্গে আরেকটি রাজত্বের যুদ্ধ হতো। রাজা বা সম্রাটগণ অন্য রাজ্য বা লোকালয় দখল করতে গিয়ে নৃশংস অত্যাচার করতেন। অনেক মানুষকে হত্যা করতেন। অন্যদের বসতি ধ্বংস করতেন। বেশির ভাগ সভ্যতায় শাসকগণ পরাজিত মানুষজনের অনেককে দাস হিসেবে বন্দী করে নিয়ে আসতেন। এই দাসদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তাদের বিভিন্ন কঠিন শ্রমের কাজে ব্যবহার করা হতো। সভ্যতার বিভিন্ন বিখ্যাত স্থাপনা তৈরি করেছিল প্রধানত এই দাসগণ। গ্রিক বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের মধ্যেও যুদ্ধ লেগেই থাকত। উপরে গ্রিকদের সঙ্গে পারসিকদের যুদ্ধের কাল্পনিক চিত্র।

রোমান সভ্যতা: সাম্রাজ্য ও ভাঙন

রোমান সভ্যতা ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী ও জাঁকজমকপূর্ণ একটি সভ্যতা ছিল। আর রোমান সাম্রাজ্য ১০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শাসনক্ষমতা ধরে রেখে তার অঞ্চল শাসন করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, ৭৫৩ প্রাক সাধারণ অব্দে নির্বাসিত দুই রাজপুত্র রোমিউলাস ও রেমাস সিংহাসন পুনরাধিকার করে যে নগরী নির্মাণ করেন, রোমিউলাসের নামানুসারেই নগরীর নামকরণ করা হয় রোম।

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণাংশের ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে রোম নগরীর পত্তন ঘটে। ইতালি ভূখণ্ডের মাঝামাঝি পশ্চিমাংশে রোম নগরের অবস্থান। টাইবার ইতালির দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী, এপেনীয় পর্বতশ্রেণি থেকে শুরু হয়ে টাইরেনিয়ান (Tyrrhenian) সাগরে মিলিত হয়েছে। ইতালির তিন দিকে সাগর। উত্তরে আল্পস পর্বতমালা, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে অ্যাড্রিয়াটিক এবং পশ্চিমে ইট্রুস্কান সাগর রয়েছে।

রাষ্ট্র

রোমের শাসকেরা সামরিক শক্তির সাহায্যে তাদের কর্তৃক ইতালির অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। আর রোমান রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন স্বয়ং সম্রাট। তার পরেই ক্ষমতার অধিকারী

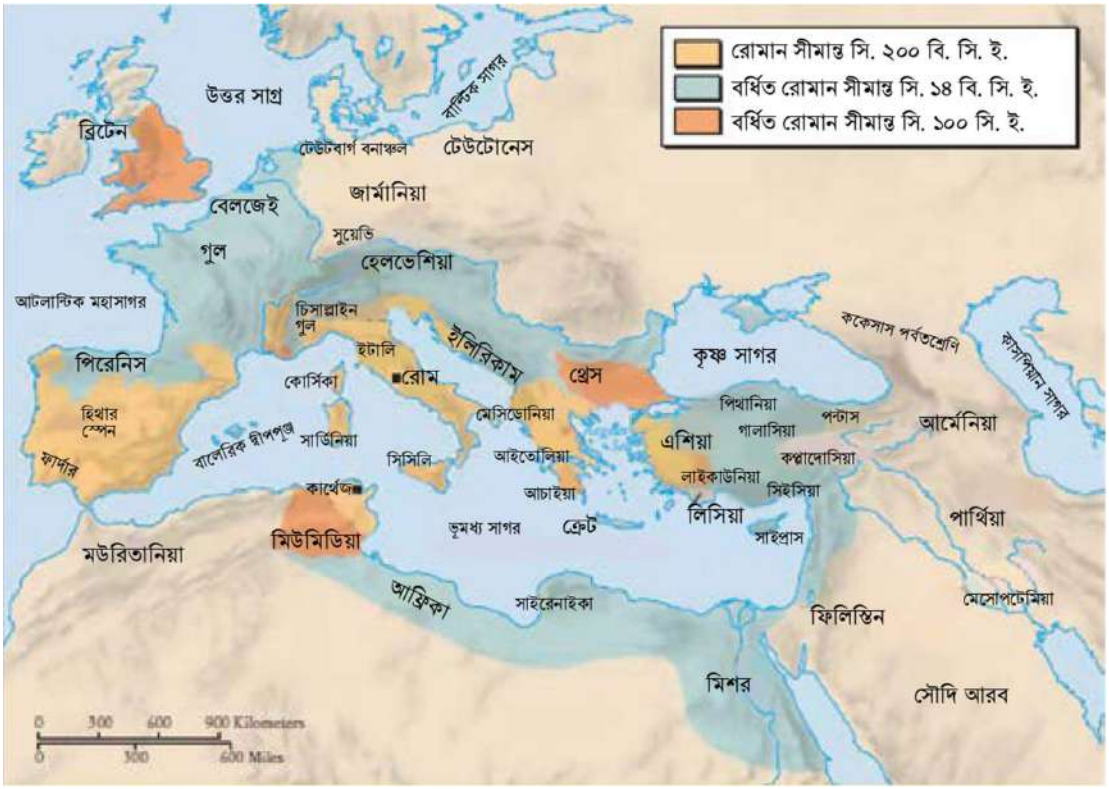

রোমান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ (১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) (Source: Adler, P. J. & Pouwels, R. L., ২০১০,World Civilizations,৬th ed.)

ছিল সিনেট। প্রাক সাধারণ অব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজতন্ত্র উৎখাত করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। রাজতন্ত্র অবসানের আগেই রোমের জনগণ প্যাট্রসিয়ান এবং প্লেবিয়ান এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। প্যাট্রসিয়ান অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণি, প্লেবিয়ান রোমের সাধারণ নাগরিক। রোমে প্রজাতন্ত্রের স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় ৫০০ বছর, আর রাজতন্ত্র বিরাজমান ছিল পরবর্তী ১ হাজার ৫০০ বছর।

সমাজ ও অর্থনীতি

রোম নগরীর পত্তনের পর থেকেই ক্রমশ লোকজনের বসতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। সাধারণভাবে রোমানরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে একক ও ঐক্যবদ্ধ একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সফল হয়েছিল। সে কারণে তাদের জীবনযাপন প্রণালি ব্রিটেন থেকে মিসর এবং স্পেন থেকে রোমানিয়া পর্যন্ত সকলেই গ্রহণ করেছিল। প্রথম এবং দ্বিতীয় সাধারণ অব্দে যখন রোমান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হচ্ছিল, তখনকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনসম্পর্কিত নানা তথ্য পাওয়া যায়। এ সময় বাণিজ্য ও উৎপাদন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন করেছিল। বাণিজ্য প্রধানত সাম্রাজ্যের গণ্ডিতে পরিচালিত হতো, কিন্তু সিল্ক রোড এবং ভারত, আফ্রিকা এমনকি চীন পর্যন্ত এটি প্রসারিত হয়েছিল।

কৃষি

সভ্যতা গড়ে ওঠার জন্য রোম একটি উপযুক্ত স্থান ছিল। টাইবার নদী প্রাচীন রোমে কৃষি বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল, যে কারণে এটি কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে ওঠে। টাইবার নদীটি রোমকে মিঠাপানি ও উর্বর মাটির যোগান দিয়েছিল। তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফসল ছিল আঙ্গুর, জলপাই ও খাদ্যশস্য। কারণ, আঙ্গুর থেকে মদ এবং জলপাই থেকে তেল উৎপাদন করা হতো। দুধ, মাংস ও পনিরের চাহিদা পূরণের জন্য গরু, ভেড়া ও ছাগল পালন করত।

স্থাপত্য

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। প্রাচীন রোমের স্থাপত্যের এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যা এর আগে ছিল না। খিলান, ভল্ট ও গম্বুজের ব্যবহার তাদের স্থাপত্যে অনেক বেশি সার্থক হয়ে উঠেছে। সম্রাট হাইড্রিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির 'প্যান্থিয়ন' রোমের অন্যতম বৃহৎ স্থাপত্যিক নিদর্শন। রোমেই তৈরি হয়েছে 'কলোসিয়াম' নামে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালা, যেখানে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারে। রোম শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি আয়তাকার ফোরাম বা প্লাজা যার চারদিকে প্রাচীন রোমের অনেক স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই কাঠামোটি রোমান জনজীবনের বিভিন্ন দিককে একত্রিত করেছিল। রোমান প্রজাতন্ত্রের যুগে এই স্থানে গণসমাবেশ, সালিশ, গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ ইত্যাদি হতো এবং এখানে তখন প্রচুর দোকান ও খোলা বাজার ছিল। রোম সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হওয়ার পর যখন ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তখন এখানে বেশ কিছু মন্দির ও সৌধ নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া রোমানরা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে পানি সরবরাহের জন্য খিলানযুক্ত কৃত্রিম নালা তৈরি করে, যাকে বলা হয় অ্যাকুইডাক্ট। রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে সুউচ্চ প্রায় ২৬০ মাইল অ্যাকুইডাক্ট ছিল। রোমান স্থাপত্যের অন্যতম আরেকটি নিদর্শন ছিল গোসলখানা বা বাথ স্পা। কিন্তু এটি রোমানদের শুধু গোসলখানা হিসেবে নয়, বরং আড্ডা দেওয়া ও গল্প করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। রোমানদের তৈরি এপ্পিয়ান রাস্তাটি এখন পর্যন্তও দৃশ্যমান রয়েছে। এগুলোতে ব্যবহৃত নকশা এতোই অনন্য ছিল যে এর শৈলীকে আমরা আজও রোমানেস্ক (Romanesque) হিসেবে অভিহিত করি। বেশির ভাগ ভবন পাথর, কাঠ ও মারবেল দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। রোমের মারবেলের সবচেয়ে কাছের উৎস ছিল তুস্কানি (Tuscany)।

শিল্পকলা

রোমান শিল্পের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজ ছিল চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য ও মোজাইকের কাজ। ভাস্কর্য এবং অন্যান্য শিল্পকর্ম ধাতু, রত্ন-পাথর, হাতির দাঁত ও কাচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। রোমান ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে চরম সাফল্য হচ্ছে পূর্ণাবয়ব এবং আবক্ষ মূর্তি দ্বারা মনুষ্য প্রতিকৃতি নির্মাণ। রোমান শিল্প গ্রিকদের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। রোমান চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু হলো প্রাণী, স্থির জীবন, প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ড, মিথোলজি ইত্যাদি।

রোমান ধর্ম

প্রাচীন রোমের ধর্ম ছিল প্যান্থিস্টিক অর্থাৎ একাধিক ঈশ্বরে তারা বিশ্বাস করতো। তবে তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার যিনি ছিলেন আকাশের দেবতা। প্রকৃতপক্ষে রোমানরা বহু দেব-দেবীর উপর বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে অন্যতম ১২ জন দেবতাকেই বিশ্বাস করতেন। এরা হলেন জুপিটার, জুনো, স্যাটার্ন, নেপচুন, প্লুটো, মার্চ, ভেনাস, মার্কারি, অ্যাপোলো, ডায়ানা, মিনার্ভা ও সেরেস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব বিস্তার করলে চতুর্থ সাধারণ অব্দে রোমান সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এটি রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।

আইন

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়ন। প্রাক সাধারণ ৪৫০ অব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে আইনগুলো খোদাই করে জনগণের জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই লিখিত আইনকে 'হেবিয়াস কর্পাস' বলে। রোমান আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। রোমানদের আইনকে আধুনিক পাশ্চাত্য আইনের ভিত্তি বলা হয়।

দর্শন ও সাহিত্য

দর্শন ও সাহিত্য চর্চায়ও রোম পিছিয়ে নেই। রোমান যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার প্লুটাক ১২টি নাটক লেখেন, যেগুলোতে তিন শতকে রোমের আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। রোমের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদের নাম 'স্টোয়িকবাদ'। এ মতবাদের দার্শনিকেরা মনে করেন, সুখ লাভ করার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যবাদী হওয়া।

রোমান সভ্যতার পতন

রোমে বসবাসকারী আদি অধিবাসীদের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের সংঘর্ষ একটি সাধারণ বিষয় ছিল। নানা উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ৪৭৬ সাধারণ অব্দে জার্মান বর্বর জাতিগুলোর হাতে রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটেছিল।

প্যান্থিয়ন

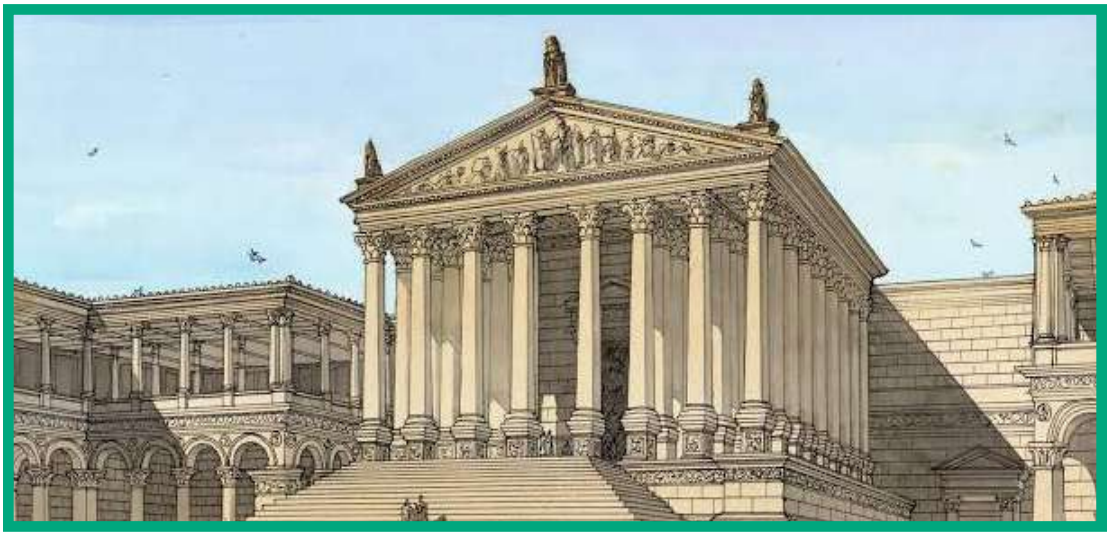

রোমের প্যান্থিয়ন মন্দির প্রথম দিকে দেখতে কেমন ছিল? শিল্পীর কল্পনায়। প্যান্থিয়ন নির্মাণ করার পরে এই স্থাপত্য মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরে এই মন্দিরকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। এই স্থাপনার উপরে যে গম্বুজটি দেখতে পাচ্ছ সেটা আধুনিক কালের আগে সবচেয়ে বড় গম্বুজ ছিল।

রোমান সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান প্রতীক হিসেবে যে স্থাপত্যটিকে আধুনিককালে বিবেচনা করা হয় সেটা হলো কলোসিয়াম। কলোসিয়াম হলো একটি গ্যালারি ঘেরা খোলা অঙ্গন। গ্যালারি কয়েকতলা বিশিষ্ট। এই ধরনের স্থাপনাকে অ্যাম্ফিথিয়েটার বলা হয়। তবে কলোসিয়ামের স্থাপত্য আরও বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট। নিচে রোমান কলোসিয়ামের ভগ্ন বর্তমান অবস্থা আর সেটা কেমন ছিল তা দেওয়া হয়েছে। এই স্থাপনা রোমান সম্রাটদের নির্দেশে নির্মাণ করা হলেও এটা নির্মাণে প্রায় এক লক্ষ ক্রীতদাস কাজ করেছিলেন। এই কলোসিয়াম তৈরি হয়েছিল রোমানদের বিনোদনের জন্য। দাসদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ, অথবা একজন দাসের সঙ্গে বাঘ বা সিংহের মতন হিংস্র প্রাণীর প্রাণঘাতি লড়াই দেখার জন্য এখানে রোমের মানুষজন জড়ো হতেন। অসংখ্য দাস এই বিনোদনে মৃত্যুবরণ করেন। এদেরই মধ্যে একজন দাস এই অন্যায় বিনোদনের বিরুদ্ধে আর নিজেদের স্বাধীনতার জন্য দাসবিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। তার নাম ছিল স্পার্টাকাস।

কলোসিয়ামের তখনকার চেহারা কেমন ছিল? হিংস্র পশুদের সঙ্গে ক্রীতদাসদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হত। সেই জন্তুদের খাঁচা আর গ্লাডিয়েটরদের কাল্পনিক চিত্র

কলোসিয়ামের বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত কিন্তু সংরক্ষিত অবস্থা

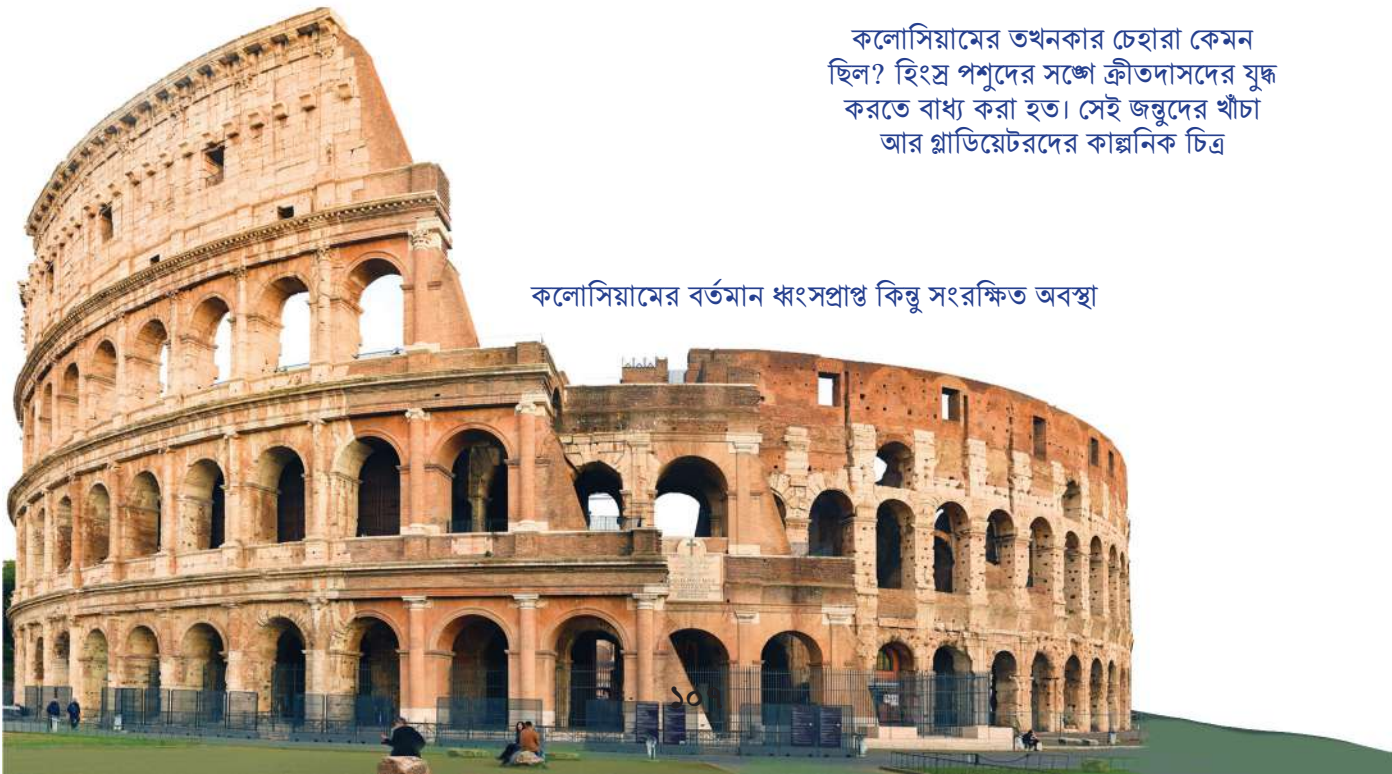

কলোসিয়ামে ক্রীতদাসগণ গ্লাডিয়েটর হিসেবে মৃত্যু না হওয়া অব্দি একজন আরেকজনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেন। গ্যালারিতে বসে দর্শকগণ সেই যুদ্ধ দেখে বিনোদন পেতেন। এমনই একটি দৃশ্যের কাল্পনিক চিত্র।

বন্দী নারী ও পুরুষদের ক্রীতদাসদের কেনাবেচার বাজরের কাল্পনিক চিত্র।

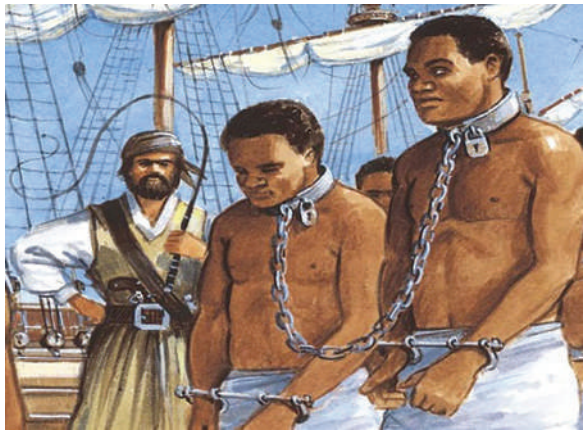

দাসদের অমানবিকভাবে কাজ করতে বাধ্য করা হতো।

রোমান রাষ্ট্রব্যবস্থার অত্যাচার ও বন্দিত্ব থেকে স্বাধীনতার জন্য দাসগণ যার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিলেন তিনি হলেন স্পার্টাকাস

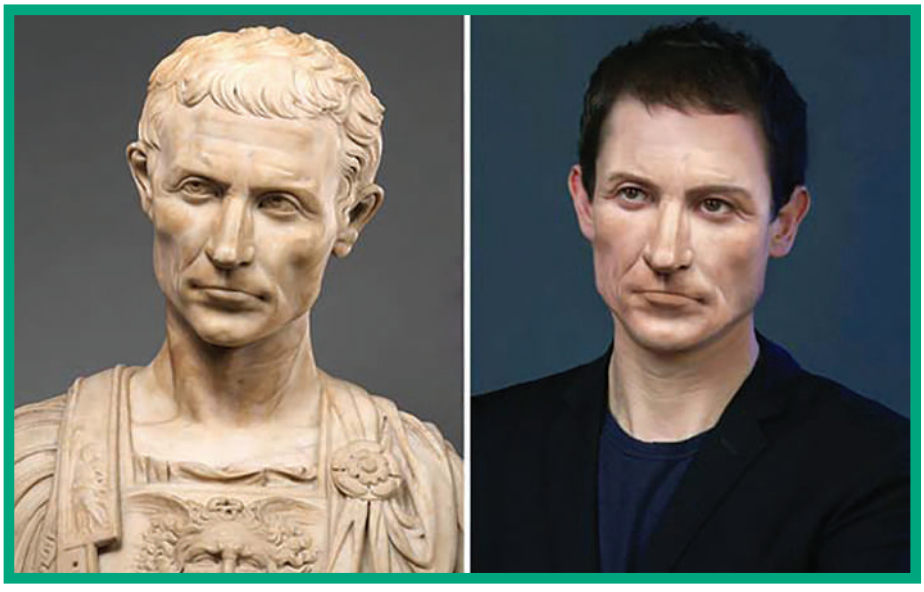

কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে ইতিহাসবিজ্ঞানী রোমান সেনাবাহিনীর একসময়ের জেনারেল ও পরে সম্রাট জুলিয়াস সিজারের চেহারা সৃষ্টি করেছেন (ডানে)। বামে জুলিয়াস সিজারের ভাস্কর্য।

কয়েকজন রোমান সম্রাটের কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে আঁকা প্রতিকৃতি।

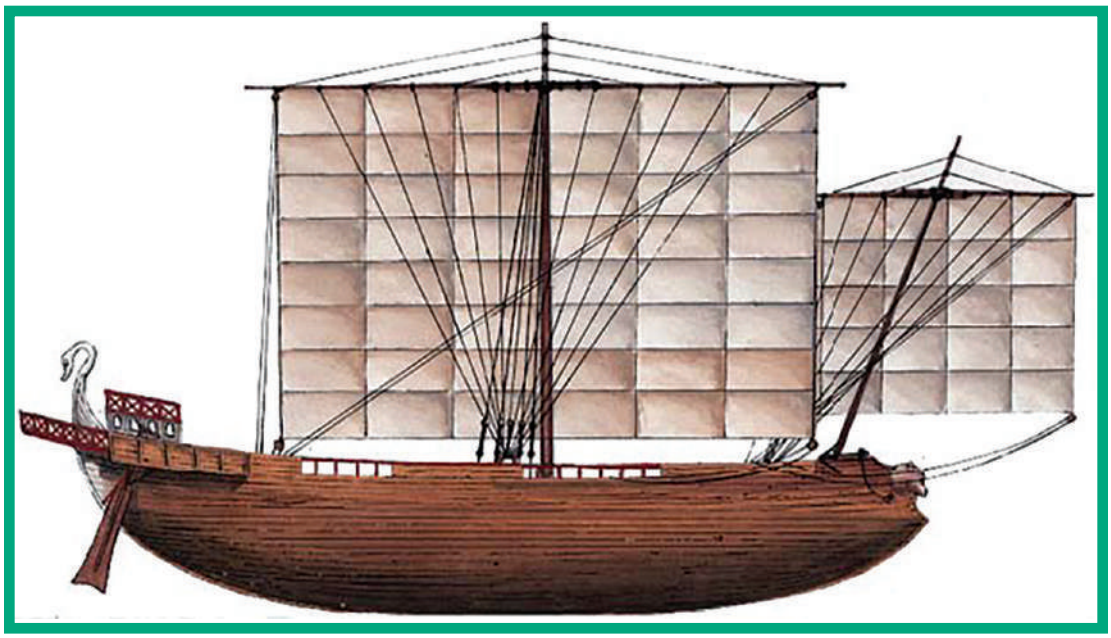

এক ধরনের রোমান পরিবহন জাহাজের মডেল

রোমান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ধরনের সৈন্য। কাল্পনিক চিত্র।

রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিল রোমান সেনাবাহিনী। বিভিন্ন ধরনের স্তরবিশিষ্ট বিশাল সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের উপরে নিয়ন্ত্রণ করায় ভূমিকা রাখত। নতুন নতুন এলাকায় আক্রমণ করে নৃশংসভাবে অত্যাচার করে মানুষকে হত্যা করতো। বন্দী করে নিয়ে এসে দাস হিসেবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করত এসব মানুষকে রোমান রাষ্ট্র, সম্রাট, ও অভিজাতবর্গ। এই সেনাবাহিনী ছাড়া রোমান সভ্যতা ও সাম্রাজ্য বিকশিত হতো না, টিকেও থাকতো না।

রোমান সেনাবাহিনীর যুদ্ধের ও হত্যার কাল্পনিক চিত্র।

রোমান নৌবহরের কাল্পনিক চিত্র।

বিভিন্ন ধরনের রোমান যুদ্ধ জাহাজের মধ্যে একধরনের যুদ্ধ জাহাজ। যে বৈঠাগুলো দেখা যাচ্ছে, এই বৈঠা টানার দায়িত্ব পালন করতে দাসদের বাধ্য করা হতো।

রোমান নৌবহরের সঙ্গে সমুদ্রযুদ্ধ (কাল্পনিক চিত্র)

রোমান একটি বন্দরে বিভিন্ন ধরনের নৌকা ও জাহাজ। এখানে যুদ্ধ জাহাজ ও পণ্য পরিবহনের জাহাজসহ নানা ধরনের নৌপরিবহনের বাহন রয়েছে। কাল্পনিক চিত্র।

রোমান সাম্রাজ্যের সড়ক ব্যবস্থা

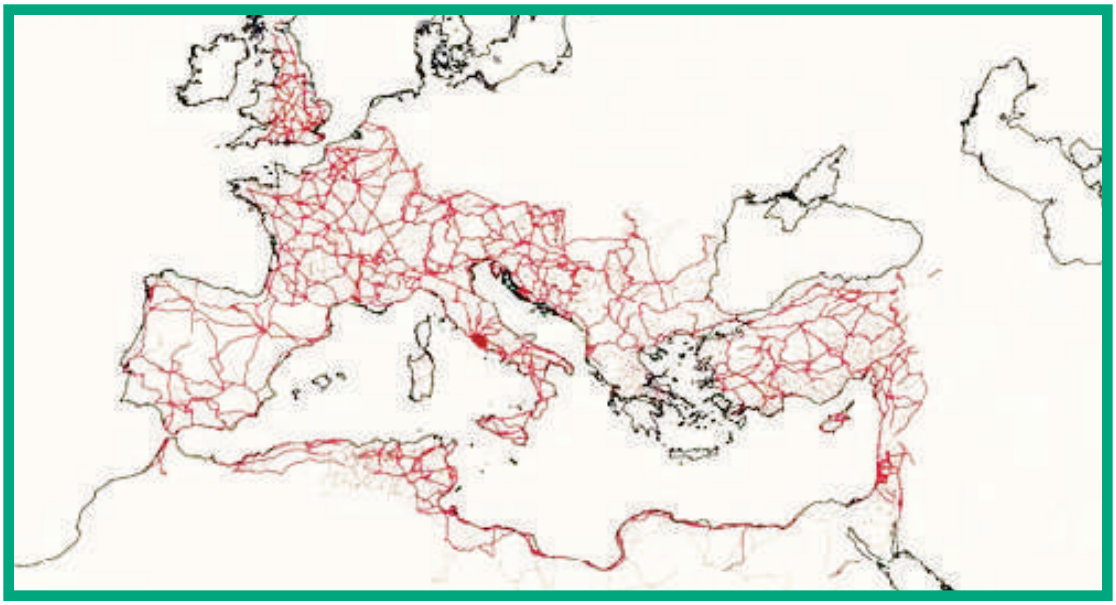

রোমান প্রকৌশলী-কারিগর-শ্রমিকদের নির্মাণ করা সড়ক রোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগব্যবস্থার মেরুদণ্ড ছিল। যুদ্ধ, যাতায়াত, পরিবহনের জন্য, বিভিন্ন দূরের অঞ্চলের উপরে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই সড়কের নেটওয়ার্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রোমান রাষ্ট্র এই সড়ক তৈরিতে গুরুত্ব দিয়েছিল। এই সড়কগুলো তৈরি করার জন্য রোমানগণ দাসদের ব্যবহার করত।
(https://i.redd.it/il৯৬০৩y০pvz৫১.jpg)

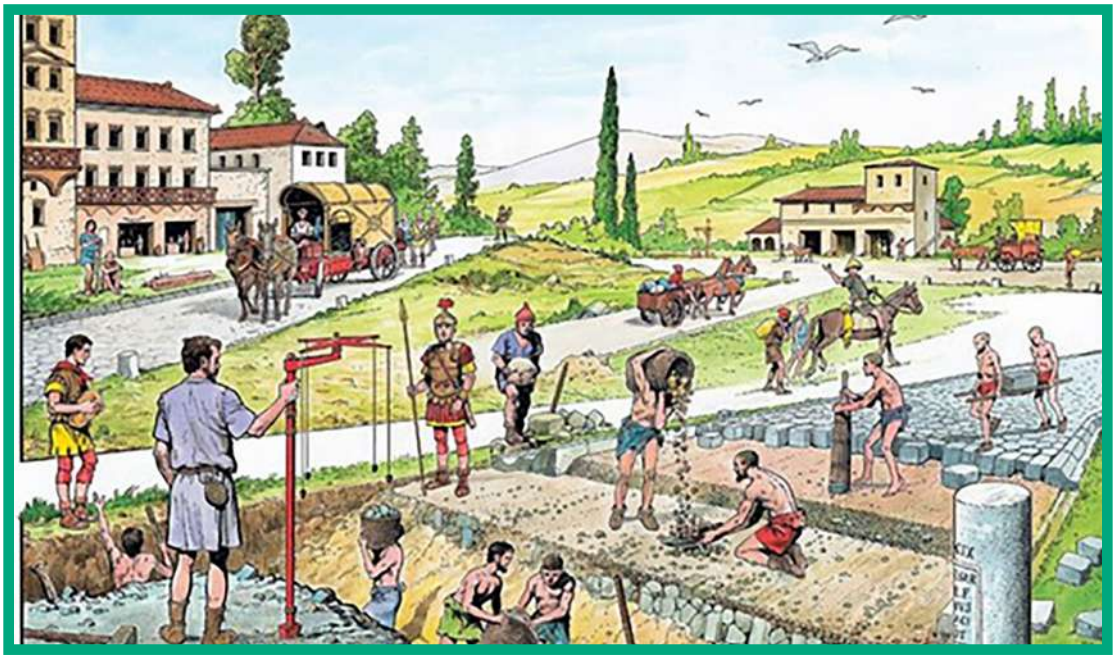

রোমান প্রকৌশলী এবং করিগরগণ স্তরে স্তরে মাটি-পাথর ফেলে রাস্তা তৈরি করতেন। রাস্তা তৈরি করার একটি কাল্পনিক দৃশ্য।

প্রাচীন রোমের এপ্পিয়ান রাস্তা (Source: britanica.com)

রোমানদের নগর ও স্থাপনাগুলোতে দূর থেকে পানি সরবরাহ করার জন্য আলাদা স্থাপনা ও ব্যবস্থা তৈরি করেছিল রোমানরা। পাইপ, খাল, ড্রেইন, সেতু ইত্যাদি মিলিয়ে একটি জটিল ও উন্নত প্রকৌশল ব্যবস্থার মাধ্যমে এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে ফ্রান্সে অবস্থিত গাখদ নদীর উপরের সেতুর মতন দেখতে স্থাপনাটি রোমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থারই একটি অংশ ছিল। (Source: britanica.com)

প্রায় ৩৫ বছর ধরে গবেষণা করে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন রোমের এই মডেলটি তৈরি করেছেন। তখনকার রোমান সভ্যতার কেন্দ্র রোম নগরী আকাশ থেকে দেখতে ঠিক এমনই ছিল।
রোম নগরের মডেলটির দৃশ্য। (সূত্র: https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/imperialfora/model.html#:~:text=To%২০commemorate%২০the%২০birth%২০of,had%২০reached%২০its%২০greatest%২০size.)

কার্থেজ, রোমান নগরী (কাল্পনিক চিত্র) (সূত্র ও কপিরাইট: https://jeanclaudegolvin.com/)

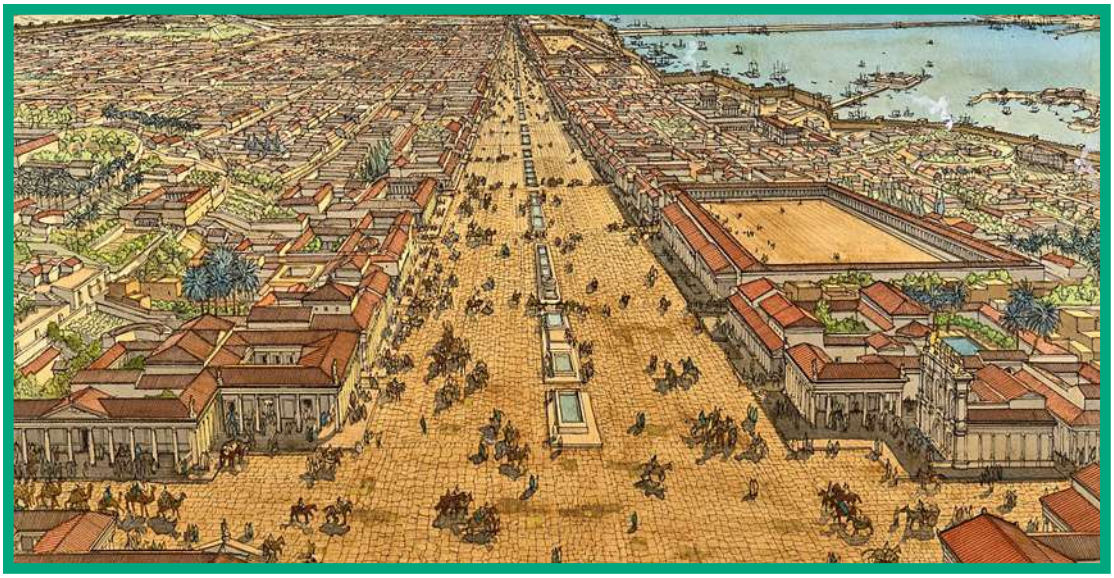

আলেকজান্দ্রিয়া নগরের প্রধান একটি সড়কের দৃশ্য। আলোকজান্দ্রিয়া মিসরীয়, গ্রিক, রোমান ও বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের সময় নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। (কাল্পনিক) (সূত্র ও কপিরাইট: https://jeanclaudegolvin.com/)

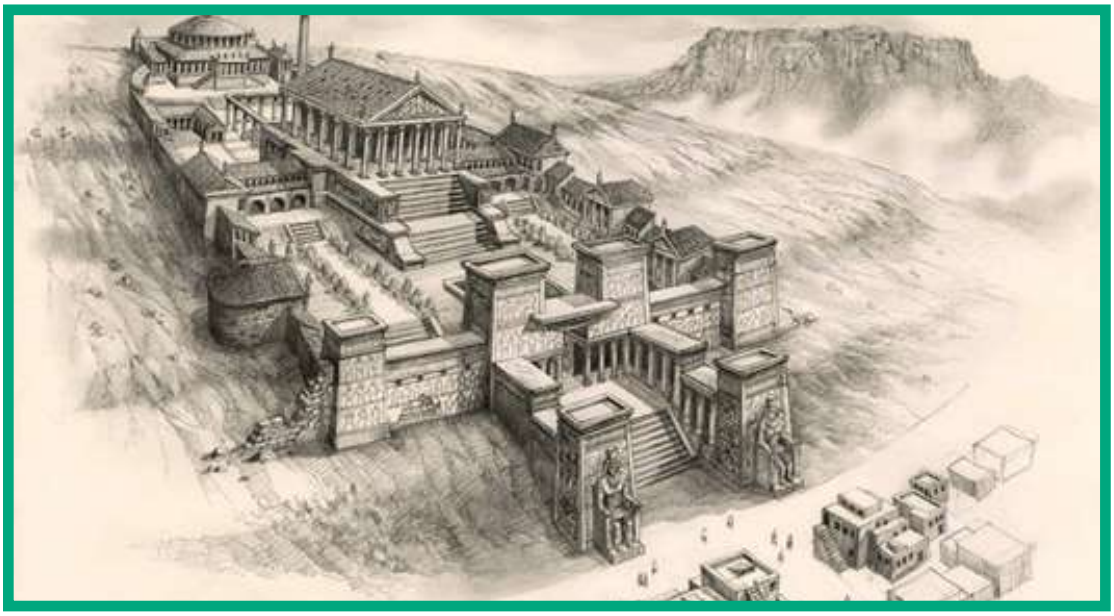

আলেকজান্দ্রিয়া নগর কেবল বহুকাল ধরে বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র, বিভিন্ন অঞ্চলের মিলনকেন্দ্র, বন্দরই ছিল না। এই নগরের দুটো গ্রন্থাগার ওই সময়ে সবচেয়ে বেশি পাণ্ডুলিপি (সেই সময়ের বই) সংগ্রহ করেছিল। পরে এই দুটো গ্রন্থাগারই ধ্বংস করা হয়।
https://peripluscd.files.wordpress.com/২০১৪/০১/libraryofalexandria.jpg

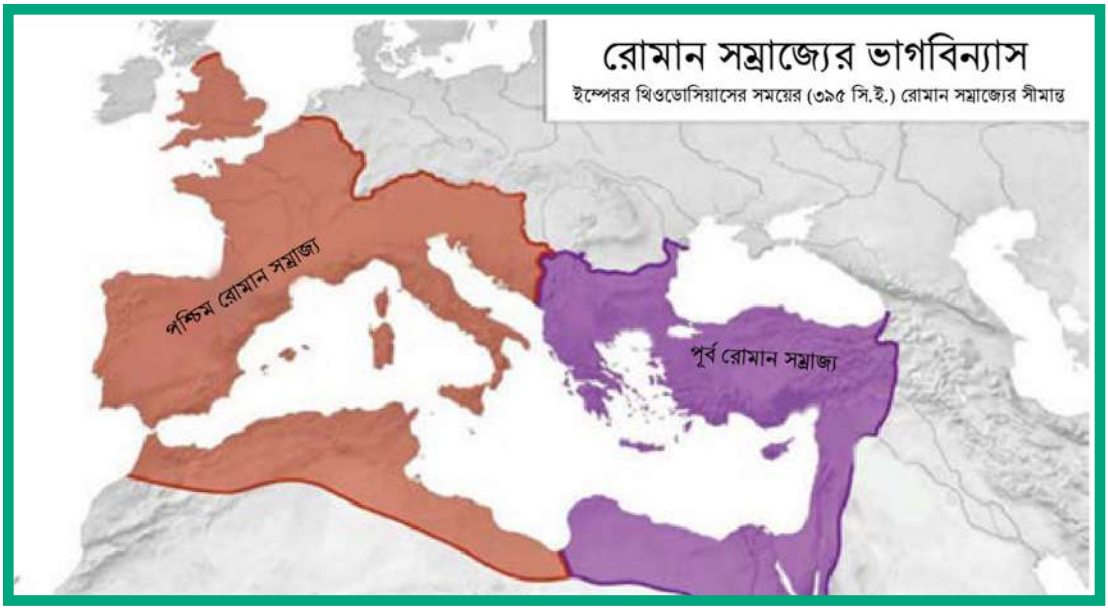

রোমান সাম্রাজ্যের দুই অংশ: পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য আর পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য।

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য।

কনস্টানটিনোপল নগরী (এখনকার তুরস্কের ইস্তাম্বুল) (কাল্পনিক চিত্র)

বাইজেনটাইন সময়ের অন্যতম বিস্ময়কর স্থাপত্য আয়া সোফিয়া

রোমান ও গ্রিক সভ্যতার মিল ও অমিল খুঁজে বের করি।

মিল	অমিল

খেলা: এক পা করে সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়া

এই খেলাটি আমরা শ্রেণিকক্ষের বারান্দায়, মাঠে বা অন্য কোনো খোলা জায়গায় খেলতে পারি। আমরা প্রত্যেকে সাতটি দলে ভাগ হই। লটারি করে একটি সভ্যতা নির্বাচন করি। এবারে প্রতিটি দলের একজন করে প্রতিনিধি এক লাইন বরাবর পাশাপাশি দাঁড়াই। প্রত্যেকে তারা যে সভ্যতাটি লটারিতে পেয়েছে সেটি বড় করে লিখে হাতে নিয়ে দাঁড়াই। শিক্ষক খুশি আপা বা অন্য দলের সদস্যরা প্রতিটি দলকে সেই সভ্যতাসংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করবে, যেটির উত্তর একটি শব্দে দেওয়া যায়। দলের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিনিধি উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে তারা এক পা এগোবে। ভুল হলে সেই জায়গায়ই থাকবে। এভাবে প্রতিটি দলকে প্রশ্ন করা হবে ১০টি। দেখিতো কোন সভ্যতা সবচেয়ে এগিয়ে যেতে পারে?

নিচের ডায়াগ্রামটি ব্যবহার করে রোমান সভ্যতার মূল সাতটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লেখার চেষ্টা করি:

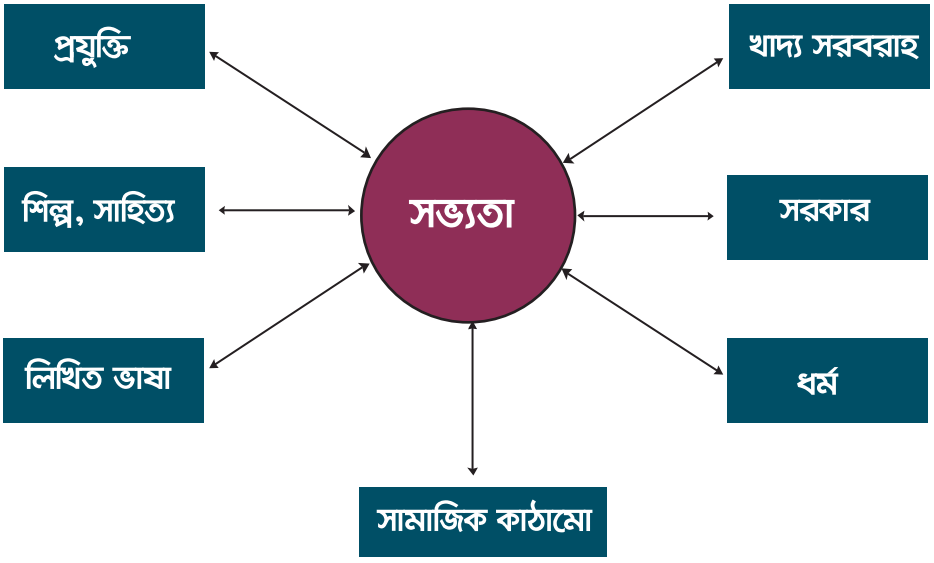

কাগজের উড়োজাহাজে সভ্যতার নিদর্শন:

তোমরা একটি কাগজে কোনো একটি সভ্যতাসংক্রান্ত একটি তথ্য বা, ছবি বা কোনো ঘটনা একে বা লিখে তা দিয়ে একটি কাগজের উড়োজাহাজ বানাও। বন্ধুদেরও বলো তাই করতে। এবারে সবাই একেকজনের দিকে ছুড়ে দাও সেই উড়োজাহাজ। আর প্রত্যেকেই বন্ধুদের ছোড়া যেকোনো একটি উড়োজাহাজ ধরার চেষ্টা করো। কাগজটি খুলে পড়ো। দেখো তো এটি কোন সভ্যতাকে নির্দেশ করে? সেটা কাগজটিতে লেখো। এবারে এগুলো দেয়ালে আটকাই সবাই। একে অন্যেরটা দেখি, ভুল থাকলে শুধরে নিই।

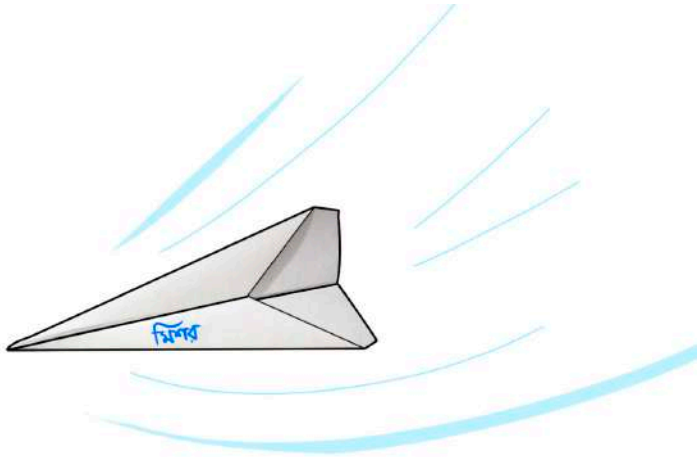

সময় রেখা তৈরি :

আমরা তো বেশ কিছু সভ্যতা সম্পর্কে জানলাম। এগুলো একেক সময়ে গড়ে উঠেছে। এবারে এসো আমরা সবচেয়ে আগের সভ্যতা থেকে শুরু করে পর পর সময় অনুযায়ী সভ্যতাগুলো সাজাই। সঙ্গে প্রতিটি সভ্যতা কোন এলাকায় গড়ে উঠেছে তা-ও উল্লেখ করব:

পরবরর্তী সময়ে নতুন কোনো সভ্যতা সম্পর্কে পরিচিত হলে সেটিও যোগ করে দিও এই সময় রেখায়। তোমরা শ্রেণিকক্ষে ছোট ছোট কাগজ কেটে এ রকম কিছু বানিয়ে দেয়ালজুরে লাগাতে পারো।

প্রথম ঘটা ঘটনাগুলো তুলে ধরি:

বিভিন্ন সভ্যতার সময়কালে বিভিন্ন স্থানে প্রথম কিছু আবিষ্কার হওয়া বা ঘটনা ঘটার কথা পড়েছ তোমরা। চলো সেগুলো খুঁজে বের করি:

প্রথম	নাম	সভ্যতা	স্থান	সময়
কাগজ	প্যাপিরাস	মিশরীয়	মিশর	

প্রথমে এগুলো ছোট ছোট কাগজে লিখি। এরপর এগুলো সময়ের ক্রম অনুযায়ী পর পর সাজাই। বোঝার চেষ্টা করি কোন আবিষ্কারের পর কোনটি ঘটেছে? একই সময়ে কী কী নতুন আবিষ্কার হয়েছে? একই স্থানে কী কী আবিষ্কার হয়েছে?

পৃথিবীর মানচিত্রে এই বিভিন্ন সভ্যতাকে চিহ্নিত করি। এগুলো কোন মহাদেশে অবস্থিত তা চিহ্নিত করি।

বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়ের ইতিহাস: রূপান্তর, বৈচিত্র্য ও সম্মিলন

তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়: 'তোমার পরিচয় কী? বা 'তুমি কে?', তুমি কী উত্তর দেবে? আবার, অন্যভাবেও আমরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করি: 'আপনার নাম কী', 'আপনার বাড়ি কোথায়?' 'বাবা-মায়ের নাম কী?' 'ঠিকানা কী?' 'আপনার দেশ কই?', 'আপনার ধর্ম কী?' 'আপনার জেলা কোথায়?' 'আপনার জাতি কী?' 'আব্বা কী করেন?' 'আম্মা কী করেন?' 'তোমার বন্ধুর নাম কী?' 'তুমি কী খেতে পছন্দ করো?' 'কী খেলা পছন্দ করো?'

উপরের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে যা যা তোমরা বলবে বা আমরা বলবো তা সবই আমাদের পরিচয় তৈরি করে। আমাদের নাম, ঠিকানা, থাকার স্থান, মা-বাবার নাম, পেশা, আত্মীয়-স্বজনের নাম-ঠিকানা-পেশা-পরিবারের অবস্থা ইত্যাদিও পরিচয় গঠন করে। অনেক সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের নাম-পেশা-বংশ-পরিবারও আমাদের পরিচয় তৈরি করে। আমরা অন্যদের পরিচয় নিয়ে যখন কথা বলি, তখনো আমরা অন্যদের পরিচয় করিয়ে দিই। বাংলাদেশের মানুষ নানা জেলায় থাকেন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে থাকেন। কেউ গ্রামে থাকেন। কেউ মফস্বলের ছোট শহরে থাকেন। কেউবা বড় শহরে থাকেন। আমাদের দেশের অনেকেই বিদেশে থাকেন। চাকরি করেন, পড়াশুনা করেন। আমরা অনেকেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বেড়াতে যাই। প্রত্যেকের পরিচয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় একই থাকে, আবার বদলেও যায়। আমাদের নাম একই থাকে। আমাদের ঠিকানা পাল্টে যায়। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস বদলাতে পারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে। ছোট থেকে বড় হয়ে গেলে। অন্যরা আমাদের চেহারা, কথা বলার ভাষা, পোশাক, লিঙ্গীয় পরিচয়, বয়স, পেশা অনুসারে বিভিন্নভাবে আমাদের বর্ণনা করতে পারেন। আমাদের মা-বাবার পরিচয় যেমন একই থাকে, তেমনই যে এতিম বা যুদ্ধে যার মা-বাবা দুজনেই মারা গেছেন, তাদের মা-বাবার পরিচয় থাকে। আবার যদি কোনো এতিমকে অন্য কোনো মানুষ নিয়ম অনুসারে দত্তক গ্রহণ করতে পারেন। তোমাদের কারও মা কিংবা বাবার চাকরিতে যদি বদলি হয়, তাহলে তোমাদের নতুন কোনো জায়গায় যেতে হতে পারে। নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হবে। নতুন নতুন বন্ধু হবে। তখন তোমার স্কুলের পরিচয়, বন্ধুদের পরিচয়, ঠিকানা, তোমার কাছে বদলে যাবে। বড় হয়ে তোমাদের কেউ কৃষিকাজ করবে, চাকরি করবে, কেউ ব্যবসা করবে, কেউ বিজ্ঞানী হবে, কেউ শিল্পী হবে, কেউ খেলোয়াড় হবে। তখন তোমার পেশাগত পরিচয় বদলে যাবে। ঠিকানা বদলে যাবে।

তাহলে মানুষের পরিচয়, আমাদের পরিচয় নানা রকমের বৈশিষ্ট্য মিলে তৈরি হয়। কিছু পরিচয় যেমন জন্মগতভাবে আমরা পাই। তেমনি কিছু পরিচয় জায়গার বদল, সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্ন জায়গা ও বিভিন্ন সময়ে আমাদের পরিচয়ের যে বদল ঘটে তা আমরা বুঝতে পারি, খুঁজে দেখতে পারি, আর জানতে পারি পরিচয়ের ইতিহাস নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলে। যেমন: আজকে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। আমাদের নাগরিকত্বের পরিচয় বাংলাদেশি। আমাদের মধ্যে অনেকেই বাংলায় কথা বলেন। তারা বাঙালি। তাদের জাতিগত পরিচয় এখন বাঙালি। আবার অনেকেই আছেন যারা বাংলায় কথা বলেন না। মান্দি, সাঁওতালি, চাকমা, মারমা, ওঁরাও ভাষায় কথা বলেন। তাদের জাতিগত পরিচয় চাকমা, মারমা, ওঁরাও, সাঁওতাল, মান্দি। আমাদের মধ্যে কেউ পুরুষ, কেউ নারী আবার কেউ তৃতীয় লিঙ্গের। সেই অনুসারে তৈরি হয় লিঙ্গীয় পরিচয়। কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিষ্টান, কেউ অন্য কোনো

ধর্মীয় পরিচয় ধারণ করেন। কেউ ভাত-মাছ খেতে পছন্দ করেন, কেউ মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন, কেউ ভাত-মাংস-ডাল খেতে কিংবা ভর্তা-সবজি খেতে পছন্দ করেনা। জাতিগত পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয়, এলাকার পরিচয়, পারিবারিক-ব্যক্তিগত অভ্যাস মিলে আমাদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, ভাষা, কথা বলার ধরন ও উচ্চারণ তৈরি হয়। আমাদের কথা বলার ধরন, উচ্চারণ, খাওয়া, পোশাক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক সময় থেকে অন্য সময়ে পাল্টে যায়। গরমে আমরা যা পরি, শীতকালে আমরা অন্য পোশাকও পরি। কেউ লম্বা,কেউ একটু কম লম্বা, গায়ের রং একেকজনের একেক রকম। ঘরে আমরা যে পোশাক পরি, ঘরের বাইরে কোথাও গেলে হয়তো আমাদের পোশাক পাল্টাতে হয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা, যে-এলাকায় থাকি সেখানকার রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান অনুসারে আমাদের ভাষা, পোশাক, আচরণ, খাওয়া, কখনো কখনো গায়ের রং পাল্টায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শারীরিকভাবে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাতে পারেন। কেউ কেউ আমাদের মতন জীবন-যাপন না করে ভিন্নভাবে জীবন যাপন করতে পারেন। কেউ কেউ অনেক কাজ ঠিকঠাক করতে পারেন না। ভুলে যান বা জৈবিক কারণে দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকে। সেগুলোর অনেক সময় আমাদের পরিচয় তৈরি করে বা পাল্টে দিতে পারে।

আমাদের মধ্যে এই যে বৈচিত্র্য, ভিন্নতা, নানা রূপ, নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা জাতি তা আমাদের দেশের খুব বড় সৌন্দর্য। বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা খারাপ কিছু না। নানা ভাষা ও নানা চেহারা দুর্বলতা না। ঠাট্টা-তামাশা করার বিষয় না। ভিন্ন কোনো পরিচয়ের মানুষকে এড়িয়ে চলতে হবে, ঘৃণা করতে হবে, হিংসা করতে হবে, ঠাট্টা করতে হবে। ভাবনা ও আচরণ কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের পরিচয়কে খাটো করে। আমরা মানুষ। এই পরিচয় কিন্তু আমাদের আরেকটা পরিচয়।

এবার তোমরা দলে বিভক্ত হয়ে তোমাদের দেখা বিভিন্ন মানুষের পরিচয় কীভাবে নির্ধারণ করা যায় তা নিম্নের ছক পূরণ করে উপস্থাপন করো-

মানুষের পরিচয়	পরিচয়ের উপাদান

আমরা বিভিন্ন যুগে বাংলাদেশের যে ইতিহাস আগে পড়েছি, সেখানে কিন্তু আমরা জেনেছি যে, আজকের বাংলাদেশ হাজার হাজার বছর আগে অন্য নামে পরিচিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমাদের এই দেশের নাম বা পরিচয় কী ছিল তা আমরা এখনও জানতে পারিনি। সেই যুগে এই ভূখণ্ডে যারা বসবাস করতো তাদের জাতিগত পরিচয় কী ছিল জানা মুশকিল। তবে ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আফ্রিকায় মানব প্রজাতির উদ্ভবের পরে তারা লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তখন পরিবেশ-সমুদ্র-নদীনালা-জলবায়ুও কিন্তু আলাদা ছিল। পরে এই অঞ্চলে যারা বসবাস শুরু করেন তাদের বিজ্ঞানীরা নানা পরিচয়ে ডাকেন। কেউ বলেন তারা অস্ট্রিক ছিলেন, কেউ বলেন, তারা দ্রাবিড় ছিলেন, কেউ বলেন তাদের মধ্যে অনেকে মঙ্গোলয়েড ছিলেন। পরে বর্তমান ইউরোপ-এশিয়ার অন্য অংশ থেকেও মানুষ এই অঞ্চলে আসেন। মানুষের এই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে বসবাস করার ইতিহাস তাহলে অনেক পুরোনো। লক্ষ লক্ষ বছর আগেই শুরু হয়েছে। এই যাতায়াতকে বলে অভিবাসন।

পরে হরপ্পা সভ্যতার শুরু হওয়ার আগে, হরপ্পা সভ্যতা বিকশিত হওয়ার সময় আর হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে নতুন নতুন বসতি তৈরি হওয়ার সময় কিন্তু আমাদের দেশে কোনো মানুষ ছিলেন, তা আমরা নিশ্চিত ভাবে

বলতে পারি না। তাদের ধর্ম কী ছিল তা-ও আমরা বিশদ জানি না। হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে। আমাদের দেশের ভূখণ্ড বর্তমান ভারত উপমহাদেশের পূর্ব দিকে। ইতিহাসবিদগণ এই মানুষদের পরিচয় জানার চেষ্টা এখনও করছেন তা তোমরা আগেই জেনেছো।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে মানুষের পরিচয় বোঝার জন্য নতুন একটা ধারণা তৈরি করেন ব্রিটিশসহ উপনিবেশ তৈরি করা দেশের বিজ্ঞানীরা। সেটাকে বলা হয় রেইস। বাংলায় বলা যায় নরবর্ণ। মানুষের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপ করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার নানা জাতির মানুষের মধ্যে গবেষণা পরিচালনা করে।মানুষের গায়ের রং, উচ্চতা, নাক ও মুখের গড়ন, মাথার খুলির মাপ, চুলের ধরন ইত্যাদি নানান বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার মানুষের মধ্যে তুলনা করে নানা রেইসে মানুষকে শ্রেণিবদ্ধ করেন। প্রথম থেকেই তাদের এই গবেষণা ও শ্রেণিবদ্ধকরণ ভুল বৈজ্ঞানিক ধারণার উপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। মানুষের ভিন্নতাকে তারা মনে করেছিলেন মানুষের শক্তিমত্তা, সাহস, বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা, আচার-আচরণ, স্বভাব, অভ্যাসের ভিন্নতার সঙ্গে সম্পর্কিত। নিজেরে তারা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত রেইস বা নরবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করলেন। তারা দাবি করলেন যে, তারা পৃথিবীতে সকলের আগে সভ্যতা তৈরি করেছে কারণ, তারা সবচাইতে বুদ্ধিমান, সবচাইতে শ্রেষ্ঠ, সবচাইতে বীর। অন্যরা তাদের চাইতে নিকৃষ্ট, কম বুদ্ধিমান, দুর্বল, আর অজ্ঞ।

নিজেদের তারা নাম দিলেন আর্য। অন্যদের বিভিন্ন নামে ডাকলেন। ঊনবিংশ শতক ও তার পরে এই রেইসের ধারণা পৃথিবীতে নানা জায়গায় ইউরোপীয় ও আমেরিকার শাসন ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর্যরা যেহেতু শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে ভালো, অনার্য বা অন্যান্য রেইসকে তাদের অধীনে ও শাসনে থাকলে অনার্যরাও উন্নতি করতে পারবে তাড়াতাড়ি– এই ছিল তাদের যুক্তি। অনেকে তখন তাদের এই ধারণাকে সঠিক বলে মনে করেছিলেন।

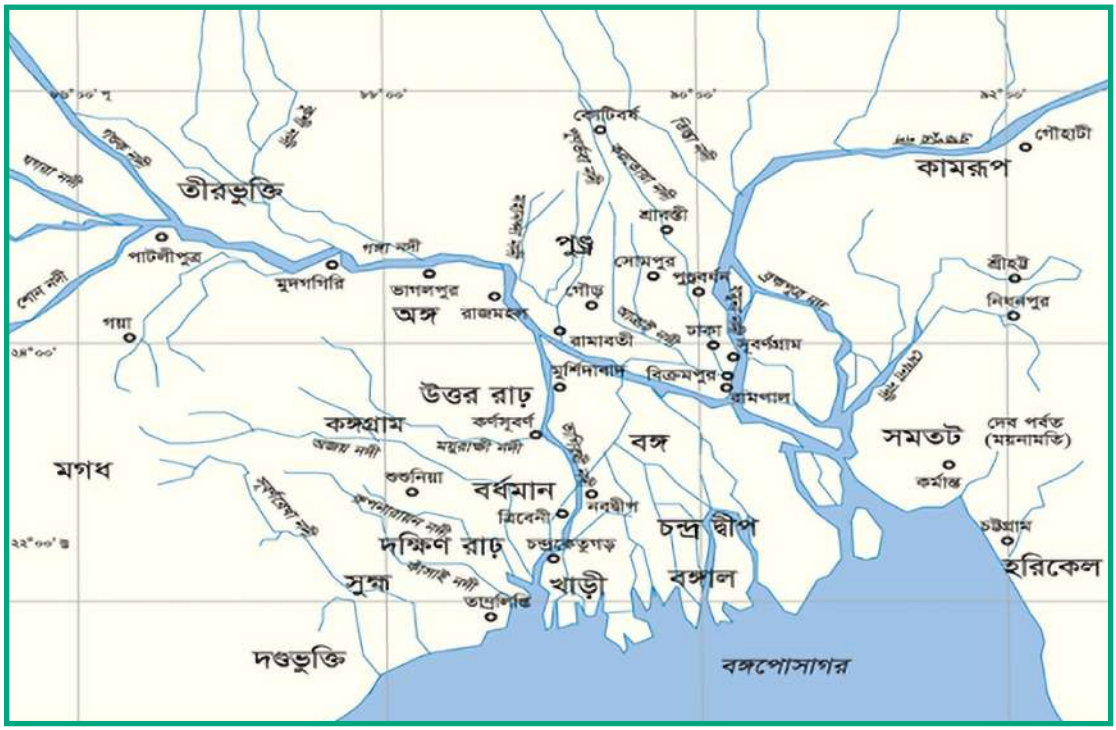

এদেরই যারা ভারত উপমহাদেশে উপনিবেশ তৈরি করেছিল, তারাও ভারত উপমহাদেশের মানুষকে বিভিন্ন রেইসে বিভক্ত করেন। মানুষকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করেন। এক দলকে তারা বললেন আর্য। তারা বললেন, এই আর্যরা হরপ্পা সভ্যতার একটা সময়ে ভারত উপমহাদেশের বাইরে থেকে অভিবাসন করেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ও বীরত্বের মাধ্যমে প্রথমে হরপ্পা সভ্যতার এলাকা এবং পরে পুরো ভারত উপমহাদেশে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার মানুষদের মধ্যে যারা ওই আর্যদের পরবর্তী প্রজন্ম, তাদের এই ইতিহাসবিদরা নাম দিলেন 'ইন্দো-আর্য' আর তারা ইন্দো-ইউরোপীয় নানান ভাষায় কথা বলতেন। অন্যদিকে, হরপ্পা সভ্যতার মানুষজনকে তারা বললেন অনার্য ও দ্রাবিড়। তাদের ভাষাও অনুন্নত, নিকৃষ্ট আর ভাব প্রকাশের অনুপযুক্ত।

ভারত উপমহাদেশের বাইরের ভূখণ্ড থেকে বিভিন্ন সময়েই দলে দলে বিভিন্ন মানুষ এসেছে। এসে স্থায়ীভাবে

বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে দূরে থাকি:

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বর্ণবাদ সম্পর্কে ধারণা পেলাম। এবার আমরা বন্ধুদের সঙ্গে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনা শেষে চলো প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে পোস্টার পেপারে তা উপস্থাপন করি-

১. বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা কীভাবে চিন্হিত করা যায়?

২. বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মধ্যে কীভাবে বিভেদ তৈরি করে?

৩. বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পরিহারের উপায় কী?

বসবাস করা শুরু করেছে। হরপ্পা সভ্যতার আগেও তারা এসেছেন, হরপ্পা সভ্যতার সময়েও অনেকে এসেছেন, আবার একটা বড় সংখ্যা কয়েক বারে তারা এসেছেন। বসতি তৈরি করেছেন। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করেছেন। কিন্তু বাইরে থেকে আসা মানুষ অন্য ভাষায় কথা বললেও, অন্য ধরনের জীবনযাপন করলেও, তারা যে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে তোলা মানুষজন বা তার পরে এই উপমহাদেশে বসবাস করা মানুষদের চাইতে রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে, শক্তিতে উন্নত ছিলেন তা কিন্তু নয়। এমনকি তখন ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানেও একই জাতির মানুষ, একই ভাষায় কথা বলা মানুষ, একই আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাসের মানুষ, একই রীতি-নীতি পালনকারী মানুষ ছিলেন তা কিন্তু নয়।

বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ভাষা, খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত মানুষেরা ছিলেন। ভিন্নতা মানেই কিন্তু কেউ ভালো, কেউ মন্দ না। মানুষে মানুষে চেহারা, গায়ের রং, উচ্চতা, শরীরের গড়নের ফারাক থাকা মানেই কেউ শ্রেষ্ঠ, কেউ নিকৃষ্ট, কেউ বেশি বুদ্ধিমান, কেউ কম বুদ্ধিমান, কেউ ভালো গুণের কিংবা কেউ খারাপ গুণের নয়। ভালো-মন্দ, বেশি বুদ্ধিমত্তা-কম বুদ্ধিমত্তা, ভালো কাজ করা, খারাপ কাজ করা, ভালো আচরণ করা-খারাপ আচরণ করার সঙ্গে শরীরের দেহ-বৈশিষ্ট্যের, রক্তের বৈশিষ্ট্যের বা বংশপরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ জন্মের পরে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে বিভিন্ন ধরনের পরিচয়ে পরিচিত হয় বা পরিচয় প্রদান করে। রেইসের ধারণা, মানুষে মানুষের মধ্যে এমন বিভক্তি, ঘৃণা ও হানাহানি তৈরি করলো যে পরে এই ধারণাকে বর্ণবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। শ্রেষ্ঠত্ব ও দুর্বলতার এই বর্ণবাদী ধারণাকে পরের ইতিহাসবিদগণ ভুল, পক্ষপাতদুষ্ট এবং মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত

করলেন। তারা বললেন, সকল মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ভিন্নতা থাকলেও নানান পরিচয়ের মানুষ থাকলেও কোনো পরিচয়ও অনাদি ও অনন্তকাল ধরে একই থাকে না। আর পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ফারাক করে অসমতা ও বৈষম্য তৈরি করা মানুষে মানুষের বিভেদ, সংঘাত ও বৈষম্য বাড়ায়।

ইতিহাসের দিকে তাকালেও আমরা নানা সময়ে এই অঞ্চলের মানুষের নানা ধরনের পরিচয়ের সন্ধান পাবো। আজ আমাদের যেমন একই সঙ্গে অনেকগুলো পরিচয় হতে পারে, ঠিক তেমনি আজকের পরিচয় অতীতের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমেরও হতে পারে। তোমাদের বোঝানোর জন্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক যুগের সূচনার দিকে ভারত উপমহাদেশের মানুষকে একদল আর্য ও অনার্য হিসেবে চিহ্নিত করলেও সেই পরিচয় কিছুসংখ্যক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষ (তখন যারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো) তৈরি করেছিলেন। তারা এখনকার বাংলাদেশের তখনকার মানুষকে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা অনার্য বা দাস বা দস্যু হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা নিজেদের সবচেয়ে ভদ্র, সবচেয়ে উন্নত, সবচেয়ে জ্ঞানী হিসেবে পরিচয় করিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারত, বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ বিরাট এক অঞ্চলে নানা ভাষায় কথা বলা বিভিন্ন চেহারার, আচারের ও রীতিনীতি মেনে চলা মানুষদের তারা 'নিকৃষ্ট' বললেন।

কিন্তু তখন অনেকগুলো অঞ্চল ছিল আলাদা আলাদা। সেগুলোর নাম ছিল মহাজনপদ। তাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমন– মগধ, গান্ধার, মিথিলা, কুরু ইত্যাদি। সেখানকার মানুষেরা সেই মহাজনপদের নামে, অথবা নিজের গোত্রের নামে, অথবা কোন নগরে বসবাস করছেন সেই নামে পরিচিত হতেন। বিভিন্ন ভাষার পরিচয়েও পরিচিত হতেন। আজকে যেখানে মহাস্থান সেই অঞ্চল তখন পুণ্ড্র নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নাম ছিল গঙ্গাঋদ্ধি বা গঙ্গারিডি। উত্তর-পূর্বাঞ্চল কিরাত দেশ নামে নামেও পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চলের একটা অংশের নাম ছিল বঙ্গ। মানুষের পরিচয়ও ওইসব অঞ্চলের নামে পরিচিত হতো। নিজেদের রীতিনীতির নামে হতো। বাচনভঙ্গির নামে, অথবা ধর্মমত অনুসারে পরিচয়ও প্রচলিত ছিল।

বর্তমান বাংলাদেশ ও বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বিহারের একাংশ মিলে যে অঞ্চলটি, সেই অঞ্চলটির মধ্যে পরিচয়েরর ভিন্নতা মোটামুটি একটা স্পষ্ট রূপ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় আরও পরের যুগ থেকে। ৭ম-৮ম সাধারণাব্দ থেকে এই অঞ্চলে কতকগুলো আলাদা আলাদা রাষ্ট্র (বা জনপদের) কথা ইতিহাসবিদগণ জানতে পারেন।

সাধারণ. ৭ম-৮ম শতকের দিকে আজকের বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম দিকের ভূভাগে কতকগুলো অঞ্চল তৈরি হয়েছিল তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, রীতিনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে। এগুলোর মধ্যে ছিল: বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, কলিঙ্গ, বিদেহ, অঙ্গ, কামরূপ ইত্যাদি। একই সময়ে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাংশ (যা বরেন্দ্র ও পুণ্ড্রবর্ধন নামেও পরিচিত ছিল) ও ভারতের পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। এখানকার শাসকগণকে গৌড়ের শাসক হিসেবে বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরা ডাকতেন। এখানকার মানুষদের গৌড়ীয়, বরেন্দ্রী, পুণ্ড্রদেশীয় নামে ডাকা হতো। তখনও বিভিন্ন পেশা ও শ্রেনির মানুষের পরিচয়ে উল্লেখ বিভিন্ন সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। প্রশাসকদের পরিচয়ও ছিল আলাদা আলাদা। কখনও কাউকে সম্মান করে কোনো বিশেষ পরিচয়ে সম্বোধন করা হতো। কখনও বা কাউকে খাটো করতে অন্য কোনো পরিচয় দিতো উঁচু শ্রেণির বা জাতির মানুষরা। শূদ্র বা অস্পৃশ্য বা দস্যু বা চণ্ডাল নামে পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা এড়িয়ে চলার কথাও কোনো কোনো লিখিত উৎসে বলা হয়েছে। আবার অন্যভাবেও একেক অঞ্চলের মানুষের পরিচয় দিতেন অন্য অঞ্চলের মানুষ। যেমন: পূর্ব-দেশীয়, পশ্চিম-দেশীয় ইত্যাদি। অন্য স্থানের বা বাইরের মানুষদের খাটো করতে যবন, ম্লেচ্ছ, ইত্যাদি নামও ব্যবহৃত হতো। শাসক কিংবা উঁচু জাতির মানুষ নিজেদের

শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্য আর অন্য এলাকা, জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষকে খাটো করার জন্যও নানা পরিচয় আরোপ করতো। পাশাপাশি, সকল সম্প্রদায়ের, অঞ্চলের, মতের, পথের মানুষকে একে অপরকে ভালোবাসার জন্য, পরস্পরের মতামতকে সম্মান করার জন্য, বিরোধ না-করার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্রাট অশোক থেকে শুরু করে সম্রাট আকবর অব্দি বহু শাসক ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের মানুষকে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে বসবাস করার জন্য বলেছেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি, তামিল এবং মধ্যযুগের বাংলা কবিতা, কাহিনি কিংবা অন্যান্য সাহিত্যের বিভিন্ন এলাকা, পরিচয়, জাতি, অঞ্চলের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় নিয়েও বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও মমতার কথা বলা হয়েছে।

মোগল আমলে বাংলাদেশসহ ভারতের কিছু অংশ মিলে যে-প্রশাসনিক একক তৈরি করা হয়েছিল তার নাম ছিল সুবা বাংলা। সুবা ছিল একেকটি প্রশাসনিক একক। সেখানে আজকের বাংলাদেশের পরিচয় ছিল বাঙ্গালাহ্ বা বেঙ্গালা। মধ্যযুগে যখন ইউরোপ থেকে বণিকেরা, পর্যটকরা বা দূতরা এই অঞ্চলে এসেছেন, তখন তারা এই অঞ্চলকে বেঙ্গালা বা বাঙ্গালাহ্ নামেও আখ্যায়িত করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিচয়ও তাদের অঞ্চলের সেই সময়ের নাম, সম্প্রদায়ের নাম, ধর্মমত অনুসারে নাম কিংবা জাতির বা ভাষার নাম ও বাচনভঙ্গির নামেও পরিচয় করানো হতো। প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা নাম সব সময়ই ছিল। সেই নামের সঙ্গে তিনি যে অঞ্চলের সেই অঞ্চলের নামও উল্লেখ করা হতো।

পরে আগেকার অঞ্চলের নাম বঙ্গ ছিল বা পরে যে অঞ্চলের নাম বেঙ্গালা বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত হলো সেখান থেকেই নাম হলো বাংলা। বাংলার পশ্চিমাংশ, উত্তরাংশ বা পূর্বাংশ ধরে কিংবা নদী-ভূমিরূপ অনুসারেও মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হতো। কাউকে বলা হতো 'ভাটির দেশের' মানুষ। কাউকে বলা হতো 'উজানের মানুষ'। নদীর এক পারের মানুষ অন্য পারের মানুষকে একভাবে চিনতো, জানতো আর মেলামেশা করতো। সেই বঙ্গ বা বাঙ্গালাহ্ থেকে নাম হলো বাঙালি। আবার যারা অন্য ভাষায় কথা বলতেন, তাদের পরিচয়ও ভিন্নভাবে দেওয়া হতো।

এই ভিন্ন ভিন্ন অনেক পরিচয় আমাদের দেশের মানুষের অতীতে ছিল। এখনও আমাদের নানা পরিচয় আছে। একই মানুষের একই সঙ্গে অনেকগুলো পরিচয় থাকতে পারে। নাম, ঠিকানা, ধর্ম, লিঙ্গ, আচার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় হতে পারে। আবার জাতি ও নাগরিকত্ব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ও হতে পারে। সকল পরিচয়ের সম্মিলনে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিচয় তৈরি হয়েছে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় আমাদের জন্য গুরুত্ব বহন করে। আমাদের অস্তিত্বের জন্য দরকারি হতে পারে। কিন্তু পরিচয়ের ভিন্নতা আর ফারাক আগেও ছিল। এখনও আছে। পরিচয়ের কারণে কাউকে ছোট করা, কাউকে খারাপ মনে করা, কাউকে ঘৃণা করা, কাউকে জবরদস্তি করা, কারও উপরে জুলুম করা ঠিক নায়। আগেও এই জুলুমকে অপরাধ ভাবা হতো। আমাদের বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনেও এই বৈষম্য ও জুলুমকে অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়। সকল ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় নিয়েই আমরা সবাই মানুষ। সকলে একই রকম হলে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য আর সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের পরিচয়ের বৈচিত্র্য, ভিন্নতা আর পার্থক্য মিলেই আমাদের আজকের বাংলাদেশ।

শরণার্থী: ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন পথে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

৬ষ্ঠ- শ্রেণি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অনুসন্ধানী পাঠ

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একতাই বল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য